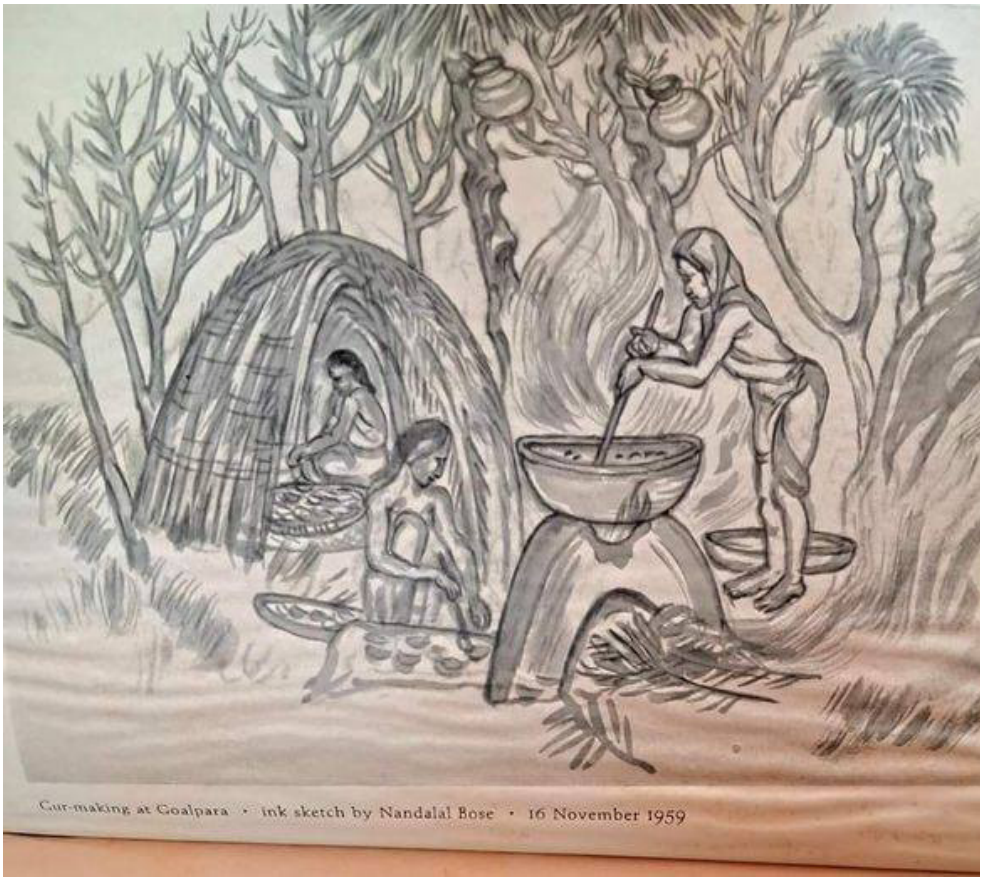

হুকার চাষী কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থা

দীপঙ্কর দে, শমীক সাহা, বিশ্বেন্দু নন্দ

সম্পাদনা **অত্রি ভট্টাচার্য**

জ্ঞানগঞ্জ

উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

হকার, চাষী, কারিগর ব্যবস্থা
Hokar, Chashi, karigor Byabostha
দীপঙ্কর দে, শমীক সাহা, বিশ্বেন্দু নন্দ, সম্পাদনা অত্রি ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদের ছবি নন্দলাল বসু; প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতা সত্যশ্রী উকিল, শান্তিনিকেতন

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, শমিত সান্যাল, দেবব্রত দে, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, শাজাহান আলি, ছৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আল মারুফ রাসেল

ছাপা, বাঁধাই বাদল ঘোষ, এরিস্টোপ্রিন্ট, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯

দাম ৮০ টাকা
প্রথম প্রকাশ ১৭ কার্তিক ১৪৩০, ৪ নভেম্বর ২০২৩
কপিরাইট নেই

‘আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি॥’

বাংলার নিজস্ব বিকেন্দ্রীভূত পারম্পরিক আর্থব্যবস্থার যদি কোনো মুর্শিদ থেকে থাকেন, তবে তিনি রামপ্রসাদ সেন। যিনি অক্লেশে রণেভঙ্গ না দিয়ে কালীকর্ষণে ‘এবার আমি করব কৃষি’ গেয়ে ওঠেন। তার গান ও কথা একটি সমৃদ্ধশালী উৎপাদন-কাঠামোর আয়না-বয়ান হিসাবে উঠে আসে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে। তার একান্ত বিশ্বস্ত মুরিদ হিসাবে এই পুস্তিকার আয়োজন আমরা করেছি। হানা আরেন্টের মতো আমরাও স্বীকার করি যে মার্ক্স একজন মহান চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি মার্ক্সকে এক কথায় বলেছেন: ‘শ্রমই মানুষের সৃষ্টিকর্তা।’ কিন্তু, হানার মতে শ্রম হল সেই জিনিস, সেই শারীরিক কার্যকলাপ, যা আমাদের প্রকৃতির সাথে আবদ্ধ করে। নিজের মার্ক্স পাঠে তিনি শুধু শ্রমের অবস্থান দেখেননি, সেইসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধগুলি দেখেছিলেন যা শ্রমের কার্যকলাপ দ্বারা চিহ্নিত একটি সমাজকে সংজ্ঞায়িত করতে আসবে। মার্ক্সের শ্রমের বিশ্লেষণে, আরেন্ট অন্য সব পেশা এবং মানবিক ক্রিয়াকলাপকে মুছে ফেলতে দেখেছিলেন। মার্ক্স, হেগেলের কাছ থেকে ইতিহাস প্রসঙ্গে তার নির্ণায়ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন, এবং আরেন্ট এই প্রসঙ্গে নতুন করে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই মানসিক কাঠামোগত সমস্যা প্রমাণ করে যে মার্ক্স পশ্চিমা চিন্তাধারার আদি ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে ঋণী ছিলেন। এর ফলে মার্ক্স ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশপূর্ব কৌমসমাজকে ‘প্রথা-কুসংস্কারের ক্রীড়নক’ এবং গ্রামসমাজকে ‘গোরু’, ‘হনুমান’রূপী দেবতাদের পূজকগোষ্ঠী হিসাবেই চিনলেন। কিন্তু, শুধু একথা বলা মিথ্যাচার হবে যে তিনি অ-ইউরোপীয় সমাজকাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। কেভিন অ্যান্ডারসন তার ‘Marx at the Margins On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies’ বইতে মার্ক্সের এথনোলজিক্যাল নোটবুকগুলির খুঁটিয়ে নিবিড় পাঠ নিয়ে দেখিয়েছেন, মার্ক্স ব্রিটিশ উপনিবেশকে একটি তীব্র অর্থনৈতিক মেরুকরণের অংশ হিসাবে দেখছেন, যেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী নব্য জমিদার-শ্রেণী এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা গ্রামবাসীদের খরচে ধনী হয়ে ওঠে। মার্ক্স বাংলার জনসমষ্টি, গ্রামীণ কৃষি-এলাকাকে ভারতীয় ভূখণ্ডের সবচেয়ে ধনী জনসমষ্টির এলাকা বলছেন। মার্ক্স, তার বন্ধু তরুণ রাশিয়ান নৃতাত্ত্বিক কোভালেভস্কির নোটে বাংলার গ্রামসমাজের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাপানো ব্রিটিশ আমলা কর্নওয়ালিসকে বর্ণনা করতে ‘দ্যা স্কাউন্ড্রেল’ এর মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। এই পুঁথি মার্ক্সবিষয়ক নয়, প্রথাগত মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধেও নয়। অবশ্য এও আমাদের জানা, প্রকৃত মার্ক্সবাদীরাই এই পুঁথির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বুঝবেন। প্রয়োজন বোধ করবেন, পুনর্নির্মাণ করার নিজেদের ইতিহাসচেতনাকে, আজকের লড়াইকেও। এ প্রসঙ্গে, নিম্নবর্গের সমাজতাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণীয়, সাম্প্রতিক সময়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন- ‘অসংগঠিত খাতের কোটি কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করলেও তাদের প্রধান লক্ষ্য পুঁজি আহরণ নয়,

কোনোক্রমে বেঁচেবর্তে থাকা। উপনিবেশোত্তর অর্থনীতির এই যুক্তির সঙ্গে মার্কস-বর্ণিত উনিশ শতকের ইয়োরোপের বা পরবর্তী বিশ শতকের আমেরিকার আকাশপাতাল ফারাক। আর্থিক বিকাশের এই নতুন যুক্তিকে আমাদের দেশের বামপন্থীরা একেবারেই আমল দেননি। সে তুলনায় পপুলিস্ট দলের নেতারা এর রাজনৈতিক তাৎপর্যটা টের পেরেছিলেন।....অথচ যে বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য বামপন্থীদের আছে, তাতে তাদেরই সবচেয়ে আগে এই নতুন পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে পারা উচিত ছিল।' [পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: সারোয়ার তুষার- তত্ত্বতালাশ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২২]

এ বইয়ের অন্যতম জরুরী অংশীদার অর্থনীতিবিদ দীপঙ্কর দে, যদিও 'সাবঅল্টার্ন' বুদ্ধিজীবীর আধাবোধোদয়ের অনেক আগেই লিখেছিলেন - স্থানীয় জ্ঞান ও কারিগরী উৎপাদন ব্যবস্থা এখনও এ দেশের চালিকাশক্তি। এই উৎপাদন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিত, পুঁজি নিবিড় নয়। কারিগর ও তার চেলার (শিষ্য, সাকরেদ) সম্পর্ক পুঁজিপতি ও শ্রমিক সম্পর্কের মত নয়, মার্কস বর্ণিত শ্রম লুটের সুযোগ এখানে নেই।...এ দেশের হকার-কারিগর ভিত্তিক আর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন বর্ণিত, অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে অনেক বিক্রেতা (ফেরিওয়ালা, ছোট দোকানদার) অনেক উৎপাদক (ক্ষুদ্র ও অতি-ক্ষুদ্র উৎপাদক, কারিগর-গ্রামীণ পরম্পরার উৎপাদক) হাজারো ক্রেতা। সিংহভাগ বিক্রেতার নিজস্ব কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, নেই কোন বিধিসম্মত ছাড়পত্র বা লাইসেন্স। উৎপাদক নিজেই কখনওবা বিক্রেতা। তারও অনেক ক্ষেত্রেই কোন আইনি ছাড়পত্র বা উৎকর্ষের শীলমোহর নেই। ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিশ্বাস নির্ভর। কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা ক্রেতা সুরক্ষা বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ আর্থব্যবস্থা বহুজাতিক বৃহৎপুঁজি বা ব্যাঙ্কিং পুঁজির আওতার বাইরে ক্ষুদ্র পুঁজি, জ্ঞান, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, নিজস্ব বাজার নির্ভর এক স্বনিয়ন্ত্রিত আর্থব্যবস্থা।' অশেষ ধন্যবাদ জানাই, বিশ্বেন্দু নন্দকে বাংলার কারিগরব্যবস্থা আর্থকাঠামোর অর্থনীতি-রাজনীতির সুলুকসন্ধান দেওয়ার জন্য। শমীক সাহার কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। আমরা যা মুখে বলি, তা তিনি কাজে করেন। ভদ্রবিত্তের মেট্রোপলিসে তিনি নামের আগে 'কারিগর' বসান। কাজেই, আমরা কারণের অকারণ হলে, তিনি আমাদের পালনীয় কর্তা। হকার সংগ্রাম কমিটি ও বঙ্গীয় হকার সম্মেলন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বয়ানগুলিরই ফলিত রাজনৈতিক প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন। তাদের লড়াই দীর্ঘজীবী হোক। এ বই স্বপ্ন দেখতে চায়, ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদের বাধা ডিঙিয়ে ভবিষ্যতের বিকেন্দ্রীভূত ডিজিটাল সমাজতন্ত্রের, কৌম-কমন্সের সেই স্বপ্নের কথাও এই বইতে তোলা থাকলো।

ধন্যবাদান্তে
অত্রি ভট্টাচার্য
১৭ কার্তিক ১৪৩০
বেহালা, পর্ণশ্রী
কলকাতা - ৭০০০৬০

কারিগর, হকার, চাষী ব্যবস্থা

বিশ্বেন্দু নন্দ

কারিগর ব্যবস্থার ভৌগোলিক ভিত্তি

তার উত্তরে বিশ্বের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ অঞ্চলের মানচিত্র দেওয়া গেল। ৪০০ বছর আগে ইওরোপের পর্তুগিজ, ডাচ, ব্রিটিশ, ডেনিস, ফরাসি মোট বড় ৫টা কর্পোরেট কোম্পানি তৈরি হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া উপসর্গ বসিয়ে। তারা তো নর্থ ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া বা দুহাজার বছর আগের রোমের সঙ্গে ব্যবসা করা সাউথ ইন্ডিয়া নাম নেয় নি। কেন ইস্ট ইন্ডিয়া নাম নিল?

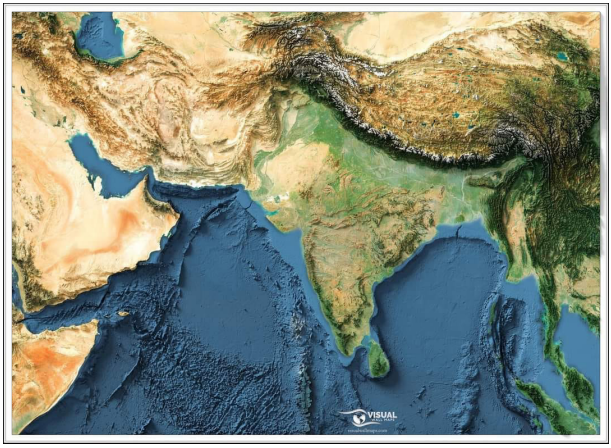

কেন বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের নাম নিল?

এই উত্তর লুকিয়ে আছে ওপরের মানচিত্রে - কেন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল সব থেকে বেশি জনঘণত্বের এলাকা। এই অঞ্চলের তুলনা বিশ্বের মানচিত্রে খুঁজে দেখান। ওপরে হিমালয়ের ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা আর নিচে গোদাবরী/নর্মদা - ওপাশে ভিয়েতনাম দক্ষিণ এশিয়া থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াজুড়ে - এই সামগ্রিক অঞ্চল গাঢ় নীল রঙে ছোপানো। এই অঞ্চলেই অধিকাংশ জল। যে জন্যে এই অঞ্চলের বর্ণনায় সুফলাংএর আগে আসে সুজলাং অর্থাৎ ফলের আগেই জল, তবেই তো ফল জন্মাবে। এই অঞ্চলই ছিল কারিগর ব্যবস্থার ধাত্রী ভূমি।

এশিয়ার মানচিত্রে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সবুজ অঞ্চল এই দক্ষিণ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, আর সব বেবাক হলুদ। তাই তো আলেকজাণ্ডারের আমল থেকে ইওরোপ দক্ষিণ এশিয়া আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আর এশিয়ার সরতাজ বাংলায় আসতে চাইছে।

আমাদের বাংলা অঞ্চলে একটা সমুদ্র আছে, পাহাড় আছে বিপুল নদী আছে, প্রচুর জঙ্গল আছে, উর্বর পলিমাটি আছে, বীজ ছড়িয়ে দিলে গাছ হওয়ার মত উর্বর মাটি আছে - এই অঞ্চল বিশ্বের সব থেকে বড়, সব থেকে বৈচিত্রময় জৈববাস্তুতন্ত্রের দেশ। সেই প্রাকৃতিক ধনসম্বল নিয়েই সোনার বাংলা।

তবুও আমরা গত ২৬৬ বছর আমদানি ভর্তুকির অর্থনীতি। ১৭৫৭র আগে সেটা ছিলাম না। আমাদের এখানে সোনা দিয়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে হত। উৎসা পট্টনায়ক প্রশ্ন করেছিলেন কেন সবুজ বিপ্লবের মত বিপুল প্রকল্প দক্ষিণ এশিয়ায় পাঞ্জাব, পঞ্চ আবের [৫ নদী] দেশে শুরু হয়, কেন ইওরোপ, আমেরিকায় হয় না। হয় না কারন ইওরোপের অধিকাংশ জমি অনুর্বর - বছরে বহু সময় বরফের চাদরে ঢেকে থাকে। আর লন্ডনের বড় নদী টেমস - আমাদের যে কোনও মাঝারি খাল তার থেকে চওড়া - গঙ্গা আর প্রমত্ত পদ্মার কথা ভুলেই যান। দক্ষিণ এশিয়ার ভারতে যা ফসল উৎপাদন হয় তার পরিমান

আমেরিকার দেড়গুণ। যে দক্ষিণ এশিয়া আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় কর্পোরেটের রমরমা। এই ভূমি আপনার দেশ, আপনার জীবন, আপনার নিজের মা-বাপের ভূমি। আপনার দেশ আপনি কেমন রাখবেন সেটা আপনার মাথা ব্যথা না হলে লুঠ হতেই থাকবে।

পাল আমলের আগে থেকেই সেন আমল গড়িয়ে সুলতানি আমল হয়ে মুঘল আমল জুড়ে বাংলা নবাবী আমলে বাংলার বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে যে স্বর্ণ শিখরে উত্তমর্ণ স্থান দখল করেছিল, উপনিবেশিক আড়াইশ বছরে সেই স্থান থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র নির্ভর লুঠ সম্পদের ভর্তুকি নির্ভর শিল্পায়নের প্রণোদনা দাতা বড় পুঁজিকে ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়, উপনিবেশিক তাত্ত্বিক এবং তাদের পোঁ ধরে নবজাগরণের মহারথীদের কল্যাণে গত দুশ বছর এই মিথমিথ্যে সযতনে গড়ে উঠছে ভদ্রবিত্ত সমাজে। ১৯৪৭/১৩৫৪র বাংলা ভাগের পর ৭০ বছর কেটে গেলেও সেই পলাশীপূর্ব উচ্চতার ধারেপাশে পৌঁছনো যায় নি। লেখক একদা বাংলার হকার, বর্তমানে কারিগর সংগঠনের সর্বক্ষণের কর্মী। সেই সংগঠন মনে করে বাংলাকে আবার স্থানচ্যুত উত্তমর্ণ স্থানে পৌঁছে দিতে গেলে বাংলার হকার, চাষী, কারিগরদের তৈরি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ পরীক্ষিত বিকেন্দ্রিভূত আর্থব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যম জরুরি। সংগঠনের ডাক ১৭৫৭র আগের উৎপাদন ব্যবস্থায় ফেরার। আগামী কোন ধরণের ব্যবস্থা আমরা গড়তে চাইছি সেই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানাই কৃষি ও কারিগর এবং সব ধরণের প্রজাপালক বাংলার শেষতম স্বর্ণযুগ বাংলার নবাবী আমলের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা, যার প্রত্নরেশ আজও বাংলার গ্রাম গঞ্জে দেখা যায়।

এই প্রতীতি পড়েই অনেকের চোখ কুঁচকোচ্ছে। মাসিক পুথির বড় পাঠক কারিগর হকার চাষী কিন্তু আরেক দল পাঠক ভদ্রবিত্ত শহুরে মানুষ যাদের জীবনে কর্পোরেটেই শেষ কথা বলেই তাঁরা মনে করেন তাঁদের জীবন জীবিকায় তথাকথিত সামন্ততন্ত্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে থেকে বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতি বিরোধী ধ্বংসাত্মক কেন্দ্রিভূত পুঁজিবাদ অনেক শ্রেয়। যেহেতু নবতম কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষক জাতিরাষ্ট্র তাদের প্রধান পালক, তাই তাদের চিন্তায়, ভাবনায়, মননে কর্পোরেট আচ্ছন্ন করে রাখে। তার মনে হয় কর্পোরেটই বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতির মূল চালক। সত্যিই কি তাই? একটা ছোট্ট সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া যাক। আজ বাংলায় পরম্পরার কারিগরি উৎপাদকের সংখ্যা অর্থাৎ যারা বংশ পরম্পরায় পণ্য উৎপাদন করেন, ৫০ লক্ষেরও বেশি সঙ্গে তাঁতি আর অভিকর শিল্পী মিলিয়ে আরও ১০ লক্ষ - মোট ৬০ লক্ষ। যদি এই ব্যবস্থার প্রত্যেক অংশিদার বছরে মাত্র ১ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেন, তাহলে কর্পোরেট উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিপুল বাংলার মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের বাজার হল ৫০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের ধারণা ঠিকমত সমীক্ষা হলে এই অঙ্ক অন্তত তিনগুণ হবে। কর্পোরেট বিরোধী পরম্পরা, বিকেন্দ্রিভূত অপরম্পরা আর চাষ ব্যবস্থা জুড়লে অঙ্কটা আকাশে ছোঁবে। ঠিক যে জন্য ২০০৮ সালের ইওরোপিয় অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা আধুনিক ভারত সামলাতে পেরেছিল গ্রাম অর্থনীতির ক্রীড়াভূমি গ্রাম অর্থনীতি আর শহরে হকারদের মত বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতির সবলতায়।

পলাশীপূর্ব নবাবাশ্রিত গ্রামীন বাংলার শূদ্র সমাজ চাই বলতে কি বোঝাই, সে বিষয়ে একটা সামগ্রিক ছবি দেখানোর শিক্ষিত বিতর্কে অশিক্ষিত, অজ্ঞ, মুর্খ, কুসংকারাচ্ছন্ন, সভ্যতার ষড়ৈশ্বর্য না দেখে গ্রামের মধ্যে বাস করা কুপমণ্ডুক শূদ্র কারিগরদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। বাংলার হকার কারিগর চাষী সমাজের ভিত্তি ছিল বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা, সে উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকত চাষী আর কারিগর।

মূলত শূদ্র গ্রাম বাংলা/ভারতের(আপাতত বাংলা বলেই বলব) সমাজ মোটামুটি

রাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ ছিল। যদুনাথ সরকার মুঘল আমল বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি দোষারোপ করে বলেছেন রাষ্ট্র যে কর তুলত, তা ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নেয় নি। তারা শুধু কর নিয়েই ক্ষান্ত দিত। আধুনিক জনকল্যাণমুখী ইওরোপিয় জাতি রাষ্ট্রের উদ্যোগে সমাজ বিকাশের যে ধারা তৈরি হয়েছে, সেটা মুঘল আমলে ছিল না। ব্রিটিশ পূর্ব বাংলার গ্রাম সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল খুবই কম, কয়েকটি চৌকিদার রাখা ছাড়া, অর্থাৎ সমাজ রাষ্ট্রকে সেই হস্তক্ষেপ করতে দেয় নি। সরকারকে গ্রামসমাজ রাজস্ব দিয়েছে ঠিকই, তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাজে সাধারণভাবে দখলদারি করতে বাধা দিয়েছে। প্রসন্নন পার্থসারথী 'হোয়াই ইওরোপ গ্রিউ রিচ...' বইতে দাবি করছেন বিশাল সেনাবাহিনী যাওয়ার জন্যে জনসমাজের যে ক্ষতি হত, রাষ্ট্র সেই ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য ছিল। সমাজ বিকাশের জন্য, তার মৌল স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে যা করার দরকার ছিল, সেটা সমাজ, কারিগর গোষ্ঠী ইত্যাদিরা নিজেরাই করত। অবশ্যই রাষ্ট্র নানান ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ করত, কিন্তু সেগুলি ছিল সামাজিক উদ্যমের বিস্তৃত রূপ। কিছু বড় কাঠামো তৈরি করা ছাড়া প্রায় সব কিছুই ছিল সামাজিক/ব্যক্তি উদ্যমের অংশ। বড় পুঁজি বরাবরই শহর এবং রাষ্ট্র নির্ভর ছিল। রাষ্ট্র পরিচালকদেরও সওদাগরদের সমর্থন প্রয়োজন হত। আজকের মতো কিন্তু বড় পুঁজি (যেমন জগৎশেঠ পরিবার, বা ব্যবসায়ী খ্বাজা আহমেদ, আমীর চাঁদ) শহর আর সরকার নির্ভর হয়ে দেশে দেশে বেড়ে উঠেছিল। মাথায় রাখতে হবে বড় পুঁজি মানেই দখলদার কর্পোরেট পুঁজি নয়। পলাশীপূর্ব সময়ে কারিগর চাষ হকার বড় পুঁজির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি থেকে আপন মর্জিতে বেরিয়ে আসতে পারত, রাষ্ট্র বা কর্পোরেট তাকে সেই চুক্তি মান্য করতে বাধ্য করতে পারত না। এতটাই ছিল কারিগরদের স্বাধীনতা। আজকে সেই স্বাধীনতা হরিয়েছে তারা কারন রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখন দেশজ উৎপাদক নয় কর্পোরেট সাথী।

আজকের তুলনায় সমাজের স্বাধীনতা অনেক বেশি ছিল। সমাজের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি ছিল বিকেন্দ্রিত কারিগর আর্থব্যবস্থা। গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থার কতগুলো জোরের জায়গা ছিল, যা এই ভেঙ্গে পড়া আড়াইশ বছর পরেও টিকে আছে, হয়ত থাকবেও। সে আলোচনা ব্রিটিশপূর্ব বাংলার সমাজ অর্থনীতি বাণিজ্য তথ্য আলোচনায় ঢোকার আগে করে নেওয়া ভাল, তাহলে বোঝা যাবে বাংলার সঙ্গে পশ্চিমের উৎপাদন ব্যবস্থারই বা পার্থক্য কোথায়, সমাজই বা এমন কেন। বাংলায় যে কেন্দ্রিভূত সমাজ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল কয়েক হাজার বছরের টানাপোড়েনে, সেটা আদতে বিশ্ব রক্ষা আর সাম্য রক্ষার আন্দোলন বলেই কারিগর ব্যবস্থা মনে করে। হাজার হাজার উৎপাদক, হাজার হাজার বিক্রেতার সমাবেশ, ফলে কারোর হাতেই অতিরিক্ত লাভ জমে থাকার সম্ভাবনা ছিল না, ছড়িয়ে যেত সমাজের মধ্যে - কারোর হাতে পৌঁছত একটু বেশি, কারোর হাতে তুলনামূলকভাবে কম।

কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলা মূলত কারিগর হকার চাষী সভ্যতা। হকার কারিগর চাষীরাই বাংলাকে আপ্রাণ চেষ্টায় উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে পরিণত করেছিলেন, যেটা ছিল তার স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আজ আমরা যে কারিগর ব্যবস্থাকে স্মরণ করছি তার বড় কারণ হল এই গ্রামীন উৎপাদক আর বণিকেরা মিলে কয়েক হাজার বছরের পরিশ্রমে বাংলাকে গড়ে তুলেছিলেন জিন্নাতুল বিলাদ, স্বর্গ ভূমি হিসেবে। সারা বিশ্বের মানুষের ঠাঁই হয়েছিল এই বাংলায়। আজ বাংলার কারিগর, কৃষক, হকার সমাজ তার হারানো মুকুট নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে। এক সময়ের উত্তমর্ণ বাংলার কোটি কোটি কারিগর কোন মাটি, কোন সমাজ, কোন অর্থনীতি, কোন উৎপাদন ব্যবস্থা, কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কোন বিশ্বজয়ী উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, যার জন্য বিশ্ব তাকে সেই সোনার মুকুট পরাতে

বাধ্য হয়েছিল, সেই অবস্থাটা জানার চেষ্টা চলছে নতুন করে। বাংলা আজ অধমর্ণ। স্বর্ণ মুকুটের দাবিদার হতে গেলে কি ছিল আর কোথায় পৌঁছতে চাইছি সেটাও জানা সঠিকভাবে প্রয়োজন।

বলতে বাধা নেই গ্রাম বাংলার কারিগর হকার চাষী নির্ভর ব্যতিক্রমী বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে প্রাতিষ্ঠনিক গবেষকেরা খুব বেশি মাথা ঘামিয়েছেন, এমন দাবি খুব কম্বুকণ্ঠে করা যাবে না। গোটা ব্যবস্থাটা, বাংলার সমাজ, বাংলার অর্থনীতিকে অধিকাংশ গবেষক, চিন্তক দেখেছেন গত আড়াইশ তিনশ বছর আগে বিকশিত চার চলকের পশ্চিমি উৎপাদন ব্যবস্থার তত্ত্বের প্রেক্ষিতে। যে অধমর্ণতা এসে বাংলার কপালে (আজ যেন মনে হচ্ছে চিরকালীন) ঠাঁই নিয়েছে গত ২৬৬ বছর, সেই অধমর্ণতা কাটাতে দাওয়াই দেওয়া চলছে শ্রমিক (কারিগর নয়) আর বড় পুঁজি ভিত্তিক, লুঠেরা চার চলকের উৎপাদন ব্যবস্থার নানান নিদান, যার সঙ্গে বাংলার ৮০ শতাংশ কারিগর তাঁতির বিন্দুমাত্র যোগ নেই। ফলে অধমর্ণতা অপনোদন হওয়া তো দূরস্থান, আরও বড় দুর্দশার মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে বাংলার কারিগর অর্থনীতির ভাগ্যাকাশে। যদিও তাকে গলা টিপে মেরেফেলা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝেই নানান কিসিমের আঘাতের পর আঘাত হেনে, তার দুপা ভেঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে তার বাজার কেড়ে নেওয়ার, তাকে মাঠের বাইরে ছুঁড়ে ফেলার। কিন্তু আশার কথা কারিগর অর্থনীতি আর সমাজের এমন কিছু সুরক্ষা জাল আছে, যা নির্ভর করে বার বার চরমতম আহত উৎপাদন ব্যবস্থা উঠে দাঁড়ায়, লড়াই করে এবং অর্থনীতির মূল চলক হিসেবে কাজ করতে থাকে।

বড় পুঁজি-নিরপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা খুব বেশি মানুষ/গোষ্ঠীর হাতে লাভ জমতে দেয় না। বিপুল সংখ্যক ছোট উৎপাদক বিক্রেতা থাকলে সেই উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থাজাত লাভ ছড়িয়ে যায় সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে - কারোর একটু বেশি কারোর কম। ঐতিহাসিকভাবে ইওরোপিয় আগ্রাসনের পূর্বে ভারত, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা মূলত বড় পুঁজি-নিরপেক্ষ অঞ্চল ছিল। সামাজিক সম্পদ তৈরি করতে সেই উৎপাদন ব্যবস্থা মাহির ছিল। তার জন্য বড় পুঁজির আগ্রাসী চরিত্রের প্রয়োজন হয় নি। বড় পুঁজি কি ছিল না? ছিল। চাঁদ বা শ্রীমন্ত বা ধনপতির মত সওদাগরেরা সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজিয়ে বিদেশে ব্যবসা করতে যেতেন, তাঁরা তো আদতে বড় পুঁজির প্রতিভূ। তাঁরা কিন্তু কর্পোরেট লুঠেরা পুঁজি হয়ে ওঠেন নি। বাণিজ্য করতে বিদেশে গিয়ে বকলমে বা সরাসরি সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন নি। সে হয়ত সওদাগর ছিল কিন্তু চরিত্রগতভাবে কর্পোরেট ছিল না। তাঁদের কর্মকাণ্ডের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবল ছিল। তাকে ঘাড় ধরে সিএসআর করাতে হত না। বাংলাজুড়ে রাস্তা, পুকুর, চিকিতসাব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চার পরিবেশ, উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থা, কারিগরদের দক্ষতা, সামাজিক সম্পদ, কারিগরদের হাতে থাকা প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তাবোধ, স্থানীয় বাজার নির্ভর উৎপাদন-বিতরণের যে ব্যপ্ত সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা তাঁরা সামাজিক উদ্যমের অংশ হয়েই করতেন, গ্রামীন পরম্পরার উৎপাদন আর বড় পুঁজি যৌথভাবে। বড় পুঁজি ছিল মূলত শহর ভিত্তিক। তার ব্যবসা বাড়াবার জন্য গ্রামের ব্যাপ্ত উপাদন ব্যবস্থার ওপর, বেশিতম উৎপাদনের অনাবশ্যক চাপ দেওয়ার সুযোগ পেত না।

বাংলা যে বাণিজ্যে বহুকাল ধরে উদ্বৃত্ত এ কথা পাল আমল থেকে, হয়তবা তার আগের সময় থেকেই নিদারুণ বাস্তব সত্য। দুর্ভাগ্যের কথা সে সত্য স্বীকার করতে চান না নানান মহল। সুলতানি আমলে সেই বৃদ্ধি চরম শিখরে উঠতে থাকে সরাসরি সুলতানদের কারিগর এবং কৃষকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার মাধ্যমে শেষ হয় পলাশীর কিছু পরে গিয়ে

লুঠেরা ইওরোপিয় জাতিরাষ্ট্রের লুঠের খাদ্য হয়ে। শহরে কারখানা গজিয়ে উঠল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে। সুলতানি, মুঘল, নবাবী আমলে নথিকৃত সীমাবদ্ধ কারখানা ব্যবস্থার সঙ্গে আজকের পশ্চিমি প্রযুক্তির কারখানার আকাশ পাতাল তফাত। কিছু হাতে গোনা কারিগর, রাষ্ট্রের উদ্যমে কারখানায় কাজ করলেও, বাংলার গ্রাম জুড়ে যে উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল কয়েক হাজার বছর ধরে, সেই দর্শন মেনে কারিগরেরা উৎপাদন নিজের বাজারে বিক্রি করতেন। উৎপাদন বেশি হলে, প্রদেশের অন্যান্য এবং বিদেশের বাজারে পাঠাতেন। শুধু বিদেশের বাজারের দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ কারিগরই উৎপাদন করতেন না, ব্যতিক্রম ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারখানাই সে কাজ করত না।

পলাশী পূর্ব বাংলা ছিল বিশ্বের তাঁতঘর, কারখানা এবং রান্না ঘর। পলাশীর বহু শত বছর আগে থেকেই বাংলায় সারা বিশ্ব আসত কৃষি এবং শিল্প দ্রব্য কিনতে। বাংলা ছিল বাংলার নিজস্ব উৎপাদন এবং নানান এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বিতরণ ক্ষেত্র। সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার রাশ ছিল মূলত কারিগরদের হাতে। কীর্তি নারায়ণ চৌধুরী, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, সুশীল চৌধুরী, ওম প্রকাশ এবং অন্য ঐতিহাসিকেদের লেখায় পাচ্ছি পলাশীপূর্ব সময়ে বাংলার কারিগরেরা এতই স্বাধীন ছিলেন যে, তাঁরা যে কোন সময়ে কোনও পণ্য উৎপাদন করার অগ্রিন নেওয়া অর্থ, যার নাম দাদন, ফিরিয়ে দিতে পারতেন, তাকে এ বিষয়ে চাপ দেওয়া তো দূরস্থান, রাষ্ট্র বা বিপুল অর্থের মালিক সওদাগরের মাথা নামিয়ে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। সব থেকে বড় কথা, যতক্ষণ না সে পণ্য হাত বদল করছে, ততক্ষণ নিজের উৎপাদনের মালিকানা কারিগর হকার চাষীর ছিল। বাংলার কারিগর, ইওরোপিয় কারিগরদের মত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দালাল, বরাতদার, সওদাগর ইত্যাদির থেকে উৎপাদনের উপকরণ অগ্রিম নিতেন না। তাঁরা নির্দিষ্ট পরিমান পণ্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ অগ্রিম (দাদন) হিসেবে নিয়ে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের চুক্তি করতেন। যতক্ষণনা উৎপাদন শেষ হয়ে পণ্য মধ্যশ্রেণীর হাতে গিয়ে পৌঁছত, তাত্ত্বিক এবং ফলিতভাবে সে পণ্যগুলি উৎপাদকের নিজের বলে বিবেচিত হত - কেননা তাঁতির তাঁত, সুতো আর শ্রম সব তার - ইওরোপিয় 'পুটিং আউট' পদ্ধতিতে সে ব্যবসায়ীর থেকে কাঁচামাল নিয়ে তার কাছে বাঁধা থাকত না। মধ্যশ্রেণী বাংলার উৎপাদকেদের তৈরি সেই পণ্যগুলি অধিকাংশ সময়ে চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই পেতেন। কিন্তু কয়েকমাস বা বছর আগে ঠিক হওয়া চুক্তির শর্ত থেকে যদি বাজারের উৎপাদন চলকের মূল্য বা অন্যান্য কিছুর পরিবর্তন ঘটত তাহলে উৎপাদকের পূর্ণ অধিকার ছিল সেই উৎপাদন মধ্যশ্রেণীকে না দেওয়ার এবং দাদন ফিরিয়ে দেওয়ার, যে অধিকার সে হারিয়েছে কেন্দ্রিভূত জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্পোরেট উৎপাদনের পক্ষে দাঁড়ানোয়।

বাংলার কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থার জোরের যায়গা ছিল যে বাংলার কারিগর হকার চাষী ইওরোপিয় কারিগরদের মত উৎপাদকের বাঁধা শ্রমিক ছিল না - তারা স্বাধীন কারিগর ছিল - নিজের ক্ষেত্রে স্বরাট ছিল। হকার চাষী কারিগরদের এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড ছিল কারিগরদের বংশ পরম্পরার উৎপাদন জ্ঞান, তার অর্জিত দক্ষতা এবং সামাজিক সুরক্ষা আর কাঁচামাল আর উৎপাদিত পণ্যের ওপর তার অধিকার। এই কটি চলকের ওপর নির্ভর করে সে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়াই কয়েক হাজার বছর বাংলাকে উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করেছিল। প্রাথমিকভাবে বাংলার উৎপাদকেরা উৎপাদন করতেন তার পাশের বাজারের জন্য। শুধুই দূরের অন্তত আজকের কর্পোরেট উৎপাদন ব্যবস্থার নীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিদেশের বাজারের জন্য উৎপাদিত হত খুব কম পণ্য, যা হত, তা ছিল মূলত অভিজাতদের ভোগ্য। তবুও বিদেশের জন্য যা উৎপাদিত হত তার

পরিমান খুব কম ছিল না, বাংলার সমাজ অর্থনীতির ইতিহাস সেই তথ্য প্রমান করে।

বাংলার কারিগরেরা শ্রমিক ছিলেন না। তাঁরা কারিগরি আর প্রযুক্তির জন্য নিজের দেশের কারিগরদের তৈরি হাতিয়ার আর যন্ত্রের ওপর নির্ভর করতেন, যে যন্ত্রের ওপর তাকে লুঠেরা পৌনঃপুণিক পেটেন্ট কর দিতে হত না, বা যন্ত্র খারাপ হলে সরবরাহকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হত না, হয় সে নিজে বা তার বাড়ির পাশেই যন্ত্র আর হাতিয়ার সারাবার ব্যবস্থা থাকত। তাঁরা উৎপাদনের শক্তি আহরণ করতেন হয় মানব দেহ থেকে না হয় পশু থেকে। অধিকাংশ উৎপাদনের কাঁচামাল তার নিজের নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকত - শাঁখ, লোহা, কিছুটা তুলো বাদ দিয়ে অধিকাংশই হয় তার নিজস্ব অথবা নিজের এলাকায় উৎপাদিত হত। কাঁচামাল প্রযুক্তি আর যন্ত্র চালাবার শক্তি যেহেতু নিজের আওতায় তাই উৎপাদনের অন্যন্য চলকগুলি তার নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধে হয় নি, বেশি উৎপাদন চাইলে তাকেও কারিগর নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সামাল দিতে পেরেছিলেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ওম প্রকাশের ডাচ বণিকদের কাজের সূত্রে জানা যাচ্ছে ১৬২০-৩০ সালে ইওরোপিয় কোম্পানিগুলি ১০ লক্ষ গজ কাপড় কিনত, সেটা ১৬৭০এর দিকে সে পরিমান বিপুল বেড়ে হল ১০ কোটি গজ। বাংলা এই গোটা ব্যবস্থার ৪০ শতাংশের অংশীদার। এই কাজে উৎপাদন ত্রিভূজে যুক্ত রয়েছেন প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তরে তুলো চাষী থেকে এক্কেবারে ওপরে বণিক/সওদাগর পর্যন্ত বিপুল শৃঙ্খল। চরকা কাটনিদের মত চরম দক্ষ মহিলা সহ বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে ভারতের মোট উৎপাদন ব্যবস্থার মাত্র ১০ শতাংশ যেত ইওরোপে। ইওরোপিয়দের হাত দিয়ে যে নতুন ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা বাংলায় বাড়ল, এই বিপুল উৎপাদনের সমস্যা সে সামাল দিল বড় কারখানা করে নয়, কাজ বাড়িয়ে, চাষ বাড়িয়ে, কাজের মানুষ বাড়িয়ে, দক্ষ কারিগর বাড়িয়ে, কারখানা বাড়িয়ে। আজ যারা দুর্ভাবনা করেন বাংলা তথা ভারতের কারিগরেরা এত বেশি জনসংখ্যাকে খাওয়াতে পরাতে রাখতে পারবেন কিনা, সে ভাবনা নিরর্থক। কারিগরেরা সেই প্রায় অসমাধানযোগ্য সমীকরণ চারশ বছর আগে সহজ সরলভাবে সমাধান করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আজও না পারার কোন কারণ নেই।

আদতে এই ব্যবস্থা টিকে থাকা আর বিরোধিতার একটা বড় কারণ হল বিকেন্দ্রিভূত ব্যবস্থা যা আদতে সাম্যাবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় কোটি কোটি বিক্রেতা কোটি কোটি উৎপাদক। ফলে লভ্যাংশ বেঁটে যায় সমাজের প্রতিটি ঘরে। কারোর বা কয়েকজনের সিন্দুকে বিপুল লভ্যাংশ জমে না। লাভের গুড় ছড়িয়ে পড়ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে।

তাই এই গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থা যেন রক্তবীজের বংশধর। তার কোন কেন্দ্র নেই। ফলে তাকে মারা কঠিন। তাই সে বিগত আড়াইশ বছরের নানান কর্পোরেট অভিচার সত্ত্বেও টিকে থাকে। এই ব্যবস্থায় বড় কারখানা তৈরি করার সুযোগ ছিল না। সুযোগ ছিল না স্বচ্ছল, ক্ষমতাবান কারিগরের পক্ষে গোটা গ্রামের কারিগরদের বাড়িতে বাড়িতে চলা কারখানাগুলিকে হোস্টাইল টেকওভারের মাধ্যমে গায়ের জোরে, রাষ্ট্র আর বড় পুঁজির মদতে কিনে নিয়ে একটা বড় কারখানা তৈরি করে একা বা কয়েকজন মালিক হয়ে গোটা বিক্রির লাভ ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পকেটে ঢোকানোর - সেই অবস্থা আজও নেই গ্রামীন কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থায়। বড় পুঁজির পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র আর কর্পোরেট এবং বড় পুঁজি সে তত্ত্ব জানে বলেই, তার পক্ষে এই উৎপাদন ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক হওয়া আত্মঘাতী। কারিগরেরা তাঁদের জ্ঞান, তাদের দক্ষতা, তাদের প্রযুক্তি নিয়ে যদি যদি সক্রিয় হন, তাহলে দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয়, সে সব উৎপাদন করা কোন সমস্যাই নয়। ফলে প্রথম থেকেই কর্পোরেট

তাকে প্রতিযোগী বেছে নিয়ে নির্বিচারে খুন করতে উদ্যোগী।

বাংলার নিজস্ব প্রচুর পণ্য তো ছিলই, কিন্তু বাংলার মূল ব্যবসা ছিল বিভিন্ন আন্তরাজ্য, আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের মাঝের দাঁড়ি (ট্রান্জিট পয়েন্ট)। উৎপাদনে বাংলা এতই অনন্য ছিল যে, বাংলাকে আমদানি করতে হত হাতে গোণা কয়েকটি পণ্য - মুদ্রা ব্যবস্থার জন্য কড়ি রূপো সোনা, অন্যান্য কিছু ধাতু, যুদ্ধ ঘোড়া, দামি অলঙ্কার। এটা মনে রাখা দরকার যে বাংলা অন্য অঞ্চলের পণ্য বিক্রির কাজে মাহির ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় ঘোড়া আমদানি হত। এগুলি আসত তুর্কি, পারস্য থেকে। এখান থেকে নানান ভাবে চিনসহ এশিয়ার নানান দেশে যেত। তুর্কি (ইংরেজদের ভাষায় টাট্টু) ঘোড়া সোজাসুজি তুর্কি প্রদেশ থেকে চলে যেতে পারত চিনে, কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটত না অর্থনৈতিক কারনেও। সেগুলি বাংলায় আসত হয় গুজরাট বন্দর হয়ে বা আফগানিস্তান হয়ে গঙ্গার দুপাশের মধ্যে উত্তরের রাস্তা ধরে শোনপুর মেলা হয়ে বাংলায়। আর একদল দক্ষিণের রাস্তা ধরে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আসত বাংলায় জল বা স্থলপথে ঘোড়া নিয়ে।

মূলত বাংলার প্রসিদ্ধিই ছিল রপ্তানির এলাকা হিসেবে। কারিগরদের প্রযুক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান, নিজস্ব কাঁচামাল আর বাজারের ওপর নির্ভর করা উৎপাদন ব্যবস্থার জোরের জন্য বাংলার সমাজ হয়ে উঠেছিল আন্তঃএশিয় বাজারের কেন্দ্রস্থল। বাংলার নিজের, বাংলার পশ্চাদভূমির, ভারত জোড়া এবং এশিয়ার নানান দেশের পণ্য, এশিয় মানচিত্রে বাংলার অসামান্য অবস্থানের সুযোগে বিভিন্ন দেশে পাঠাত বাংলায় ঘাঁটি গেড়ে বসা এশিয় বণিক সওদাগরেরা। বাংলার হকার চাষী কারিগরেরা চাষ, কারখানা ভিত্তি করে মানুষের ন্যুনতম জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে দামিতম বিলাসদ্রব্য উৎপাদনকর্ম করত। বিশ্বের সওদাগরেরা সেগুলি কিনতে বাংলায় আসত সোনা রূপা বা অন্যান্য ধাতুর বিনিময়ে। 'ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লাইন...' বইতে সুশীল চৌধুরী বলছেন, বাংলার বণিকদেরও এই ব্যবস্থায় কোন ছাড় ছিল না, তাদেরও বাংলার টাঁকশালে রূপো জমা দিয়ে নিজের মাটিতেই পণ্য কিনে দেশে বিদেশে ব্যবসা করতে হত।

যদুনাথ সরকার 'দ্য মুঘল এডমিনিস্ট্রেশন'এ বলছেন ভারতের মুঘল (তার আগে সুলতানি, সেন এবং পালেদেরও এই তালিকায় জুড়তে হবে) শাসকেরা (এবং) চাষী আর কারিগরদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন - কেননা তারা জানতেন চাষী আর কারিগরদের দেওয়া রাজস্ব সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি তৈরি করে। নবাবি আমল পর্যন্ত কুঠিতে সেনা রেখে ব্যবসা করা সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপিয় বণিকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না স্বাধীন উৎপাদক কারিগরদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনার। আজকের কর্পোরেট-রাষ্ট্র প্রণোদিত পরম্পরার হকার কারিগর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসের নীতির প্রেক্ষিতে পলাশীর আগে নবাবেরা কী ভাবে চাষীদের পাশে দাঁড়াতেন তার একটা উদাহরণ তুলে দেওয়া গেল এন এ সিদ্দিকীর 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০)' বই থেকে। জনাব সিদ্দিকী কৃষকদের জমি বন্ধক দেওয়ার অধিকার ছিল কিনা তাই সন্ধানে 'দস্তুর-উল-আমাল-বেকাস' গ্রন্থে উল্লিখিত জমিদারদের একটি অঙ্গীকারনামার বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন ...'দস্তুর-উল-আমাল-বেকাস' গ্রন্থে জমিদার অথবা মোকাদ্দাম প্রদত্ত এক অঙ্গীকারনামা হইতে আলোচ্য বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জমিদার-কৃষক সম্পর্কে ও তাঁহাদের পারস্পরিক দাবিস্বত্ত্বের ধারা কিরূপ ছিল। তাহার উল্লেখ উক্ত অঙ্গীকার-নামায় রহিয়াছে। আলোচ্য দলিলের মূল বক্তব্যগুলি এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

১। উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমানের ভিত্তিতে স্বীকৃত বাৎসরিক জমা দিতে জমিদার অঙ্গীকারবদ্ধ। ফসলী জমির প্রকৃত পরিমান সরকারী খাতায় যে হারে উল্লিখিত রহিয়াছে,

জমিদার সেই হারেই প্রতিটি কৃষকের নিকট হইতে নির্ধারিত জমার অংশ সংগ্রহ করিবেন।

২। বিঘা প্রতি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে জমিদার অন্য কোন প্রকার কর কৃষকদের কাছ হইতে আদায় করিতে পারিবেন না।

৩। তাঁহারা এমন কোন দাবি করিতে পারিবেন না, যাহার ফলে কৃষক গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

৪। যদি কোন কৃষক কোন কারণে গ্রাম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে জমিদার ঐ কৃষকের জমিতে উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পরও যদি ঐ কৃষকের কোন ভূমি-রাজস্ব থাকে, তবে তাহা গ্রামের অন্যান্য কৃষকের মধ্যে সমহারে বন্টিত করিয়া দেওয়া হইবে।

৫। যে সব কৃষক গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে পরের বৎসর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বসবাস করেন, এবং নিজ নিজ জমিতে চাষবাস পুনরায় শুরু করেন, তাহার ব্যবস্থা জমিদারকে করিতে হইবে।

৬। যদি কৃষক পুনরায় গ্রামে বসবাস করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার জমি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের আনুপাতিক হারে জমিদারগণ নিজেদের মধ্যে বিলি করিয়া লইয়া সেই জমিতে চাষ শুরু করিয়া দিবেন।

৭। নিজেদের জমি বিনা মজুরিতে চাষ করিয়া নিবার জন্য কৃষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ জমিদার দিতে পারিবেন না।

৮। রায়তের ক্ষতি করা চলিবে না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দেব। 'প্রাক-পলাশী বাংলা' বইতে ব্রিটিশদের হাতে বাংলা লুঠ তত্ত্বের বিরোধী ভারতের ইতিহাস লেখার কেম্ব্রিজ ঘরানার তাত্ত্বিক পি জে মার্শালের অনুগামী ঐতিহাসিক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ...মুর্শিদকুলি খাঁ পতিত ও অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছোট ছোট কৃষকদের উৎসাহদানের জন্য তাঁর রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৃষকদের হালের গরু আর মহিষ কেনার জন্য সরকারি ঋণ ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষের সময় আনাবৃষ্টির সময় শস্যের ক্ষতি হলে তিনি কৃষকদের খাজনা মকুব করে দিতেন (ঠিক এর সঙ্গে তুলনা করুন ছিয়াত্তরের গণহত্যায় ব্রিটিশ শাসকদের খাজনা মকুবের দাবির উত্তরে - খাজনা তো তারা মকুব করেনই নি, তারা খাজনার পরিমান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং এই সময়ে বাংলা সুবা থেকে সব থেকে বেশি খাজনা আদায় করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য)। কৃষি জমিতে যাতে ভালভাবে চাষ হয়, তার জন্য তিনি কৃষকদের কৃষি ঋণ (তাকাবি) দেওয়ারও নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার জমিদারদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। কৃষক বা রায়তের ওপর অত্যাচার হলে জমিদার সহজে নিস্তার পেত না। এজন্য তাঁর সময়ের জমিদারেরা সব সময়ে সন্ত্রস্ত থাকত। জমিদারের উকিল নবাবের দরবারের আশেপাশেই বিক্ষুব্ধ রায়তের খোঁজ করত। এ রকম কোন বিক্ষুব্ধ রায়তের সন্ধান পেলে নবাবের অভিযোগ পেশ করার আগেই উকিল তাকে খুশি করে বিরোধ মিটিয়ে নিত। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দি (মুঘলদের কৃষি নীতি অনুসরণ করে) বাংলার কৃষকদের রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের ওপর নজর রাখতেন। মারাঠা আক্রমনের সময় আলিবর্দি কৃষির পুনর্গঠনে মন দিয়েছিলেন। বাংলার বিদ্ধস্ত গ্রাম ও কৃষি গড়ে তোলা ছিল তাঁর জীবনের শেষ কাজ। সমসাময়িকদের লেখা থেকে এ তথ্য জানা যায়। কৃষি বাংলার জাটিয় সম্পদ। কৃষি ও কৃষককে রক্ষা করাকে বাংলার নবাবেরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। কৃষক(হয়ত

কারিগরদেরও) পৃষ্ঠপোষণা করাই ছিল প্রাক-পলাশী যুগের রাষ্ট্রনীতি।

সুবোধবাবু কারিগরদের কথা বলেন নি, সেটাও নবাবদের দেশিয় উৎপাদন ব্যবস্থা পালন নীতির অঙ্গ। এই উৎপাদন ব্যবস্থা ওপর আঘাত হানা আর বিশ্ব বাজার থেকে কারিগরদের বিচ্ছিন্ন করার কাজটা ইওরোপিয় কর্পোরেট কোম্পানি করতে পেরেছিল বাংলা/ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকের পতন ঘটিয়ে, যার সূত্রপাত ঘটে পলাশীর চক্রান্তে।

কয়েক হাজার বছর ধরে, নিজস্ব বিদ্যালয়(পাঠশালা, মক্তব ইত্যাদি) ব্যবস্থা, স্মৃতিনির্ভর পড়াশোনা আর বাজার নির্ভর পরীক্ষা এবং নিজস্ব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বাংলার কারিগর হকার চাষী আর বণিকদের দক্ষতায় আর জ্ঞানে বাংলা ছিল বিশ্বজয়ী। ১৭৫৭য় যে ব্যবস্থার পতনের সূত্রপাত হল, তার ফলে বাংলা অধমর্ণ দেশে পরিণত হল। এবং নানান অন্তর্ঘাতে বাংলা আজ মুহ্যমান। যে সম্মান সে হারিয়েছে ২৬৬ বছর আগে, সেই অবস্থান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে ধার করা ইওরোপিয় জ্ঞান আর প্রযুক্তির এবং প্রায় চাপিয়ে দেওয়া লুঠেরা একটি বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। গত সত্তর বছর ধরে প্রচুর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আড়াইশ বছর আগে যে বাণিজ্য স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে ছিল বাংলা, তার চরণস্পর্শও করতে পারে নি সে। দিনের পর দিন তার ওপরে কেন্দ্রিভূত, দূষণ ছড়ানো, দক্ষতাহীন, লুঠেরা পশ্চিমি উৎপাদন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে, যে ব্যবস্থা ইওরোপ আছে বাতিল করে দিতে বদ্ধ পরিকর। যে জন্য ইওরোপে আজ দূষণ বিরোধী নানান আইনে বেঁধে ফেলছে তার বড় শিল্পকে। আজ সারা বিশ্বজুড়ে নিজের বাজার ভিত্তিক, ছোট উৎপাদন ব্যবস্থা চালুকরার আন্দোলন জোর পাচ্ছে। জৈব কৃষি নামে ফিরে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া বাংলার চাষাদের নিজস্ব কৃষিকর্ম। আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব পড়তে চলেছে।

ইওরোপিয় উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থার তত্ত্বের বিন্দুমাত্র কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই জন্য স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার ধ্রুপদী বামপন্থী অর্থনীতি বলতে যা বোঝায়, আমরা আমাদের সংগঠন তার থেকে সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থানে বিচরণ করছি - তাত্ত্বিক ও তাথ্যিকভাবেও। কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থায় চারটি উপাদানের পশ্চিমি তত্ত্বর প্রভাব আমরা স্বীকার করি না, সম্পূর্ণ বিরোধ করি।

--

আরও কিছু তত্ত্ব কথা

কারিগরী জ্ঞান, প্রযুক্তি, বাজার, প্রযুক্তি-পণ্য বিকাশ সবই হয় ব্যক্তিগত নয় গোষ্ঠীগত, না হয় সামাজিক উদ্যম ছিল। ফলে কারিগরদের কাজের সঙ্গে বিগত একশ বছর ধরে বিকশিত রাষ্ট্রীয় মালিকানার কোন যোগ নেই। আমরা আমাদের পূর্বজ কারিগরদের তৈরি করে দেওয়া দর্শন অনুযায়ী মনে করি সামাজিক উদ্যমে রাষ্ট্রের দখলদারি সামাজিক উদ্যমে ক্ষতিকর এবং অবাঞ্ছিত। রাষ্ট্রের কাছে অধিকার চাওয়াও আদতে সমাজের অস্বিত্ব বিলয়ের রাষ্ট্রের তৈরি করা ধারণা। এতে যদি কেউ আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, বলবেন। মার্ক্স আর গান্ধী উভয়েই রাষ্ট্র বিলয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

পরম্পরার উৎপাদকেরা নিজেদের স্থানীয় বাজারের ওপরে নির্ভর করেছেন, এবং সেই বাজারের বৈচিত্র্য ছিল অসাধারণ। একটি বাজার তার রূপে, বর্ণে, সম্পদের বিক্রিতে, তার ক্রেতা-বিক্রেতাদের বৈচিত্র্যে অনন্য, বলা যেতে পারে তার কয়েক ক্রোশ দূরের পাশের বাজারের চরিত্র থেকে অনেক সময়ই সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থানীয় বাজার বাজার একটা বড় ভূমিকা পালন করত। সেই বাজারে বিক্রির পরে যদি তার কোন কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, সেটা সে প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠাবার কথা ভাবত। যেহেতু

পলাশীর পর বাংলার হাজার হাজার বৈচিত্র্যপূর্ণ বাজার কর্পোরেট উৎপাদন ব্যবস্থার দখল করার চেষ্টা করেছে, এবং বাংলার কারিগরদের আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তাই বার করে দিয়েছে, ফলে নিজের বাজারে বিক্রির পর যে উদ্বৃত্ত বিদেশের বাজারে বিক্রি করে অতিরিক্ত লাভ করতে সেই লাভটা তার আর থাকল না, যে সমৃদ্ধি সে তৈরি করেছিল তিলে তিলে সে সমৃদ্ধির ইতি ঘটল।

বাংলার পরম্পরার উৎপাদনের অভিন্ন বাজার একটি সোনার পাথরবাটির ধারণা। বিশ্লেষকেরা মূলত ব্রিটিশপূর্ব বাংলার বাজার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন কয়েকটি বড় কর্পোরেট পাইকারি বাজারের ওপর নির্ভর করে সেটাও যে বাংলার কারিগরদের ব্যবসা আলোচনায় যথেষ্ট নয় তা বলাই বাহুল্য। ফলে এতদিন শুধুই নজর গিয়েছে বড় ও পাইকারি বাজারের দিকে, তার বাইরের ছোট ছোট বৈচিত্র্যময় বাজারের দিকে আলোচকেরা তাই নজর দেন নি। সেই কাজটি আমরা করার চেষ্টা করছি সাঙ্গঠনিকভাবে, গবেষণায়। এই প্রবন্ধের মূল উপাত্ত যেহেতু সেই সময়ের সাহিত্য, এবং ভ্রমন কাহিনী, এবং সাংগঠনিক সমীক্ষা, তাই বাজারের বৈচিত্র্যটি ঠিক আসবে না। লুঠেরা, খুনি, দখলদার কেন্দ্রিভূত প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার তত্ত্ব দিয়ে কোনভাবেই বিকেন্দ্রিত, শুধু লাভের দিকে নজর না দেওয়া দক্ষতা, প্রযুক্তি হাতে নিয়ে, মূলত নিজের বাজারের জন্য কাজ করা কারিগরদের উৎপাদন ব্যবস্থার দর্শনটাই, ভালবাসা, জ্ঞান সব কিছুই আলাদা রকমের।

পশ্চিমী প্রযুক্তির নির্বিচার প্রয়োগে ধ্বংসের মুখোমুখি আজকের বিশ্ব। শিল্পবিপ্লবের অন্যতম ফল, ইয়োরোপের (আর আমেরিকার) বাইরে বিকশিত জ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস হয় বলপ্রয়োগে ধংস, যেখানে পারেনি সেখানে তাকে ন্যুন দেখিয়েছে। ইওরোপে যখন পারম্পরিক প্রযুক্তি আজ শুধুই জাদুঘরে সাজিয়ে রাখার, সেখানে আফ্রিকা, এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে এই প্রযুক্তি আজও জীবন্ত, আজও কয়েক কোটি মানুষ এক্কেবারে নিজ উদ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সরকারি, বেসরকারি, কর্পোরেট আগ্রাসন সত্বেও, হারিয়ে যাবার টিকা সযত্নে কপালে এঁকেই। ইংরেজি শিক্ষিত শহুরেদের উপেক্ষা সত্বেও গ্রাম-শহরের হাট এই শিল্পকে নিজ উদ্যমে লালন পালন করে চলেছে।

বিগত ২৫০ বছর ধরে কেন্দ্রীভূত, সম্পদ অপচয়ী, শুধু লাভের জন্য আর সামরিক অভিযানের কারনে বিকশিত প্রযুক্তি (ইয়োরোপের প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল নেশন স্টেটের তত্বাবধানে, সামরিক-রাজ শক্তির ছত্রছায়ায়। তাই যে জ্ঞান/প্রযুক্তি/সমাজ সামরিক নয় তার সঙ্গে জুড়তে হচ্ছে সিভিল উপসর্গ - সিভিল সোসাইটি, সিভিল আরকিটেকচার, সিভিল কনসট্রাকসন ইত্যাদি) নিয়ে গ্রামীণদের আক্রমণ করতে উদ্যত ইয়োরোপ আমেরিকা। এই প্রযুক্তির দূষণ ছড়ানোর চরিত্র আজ উন্মোচিত। তবুও এশিয়ার প্রত্যেকটি সরকার, অসরকারি সংগঠন এই প্রযুক্তি তৃণমূলস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য অসম্ভব উদগ্রীব। তার জন্য ঋণ, দানে সকলকে সজ্জিত করা হচ্ছে, বিপুল পরিমাণ গ্রামীণকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। শুধু স্বাধীন ভারতে উন্নয়ন উদ্বাস্তু ২০ কোটির আশেপাশে। বিগত ২৫০ বছর এই প্রযুক্তি অবলম্বন করে যে উন্নয়নকর্ম ঘটে চলেছে, তাতে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার অধগতি প্রমাণিত। দিনে দিনে সে আরও ঢালু পথে গড়িয়ে পাতালে প্রবেশ করছে। ১৭৫৭য় অবিভক্ত ভারতবর্ষের জিডিপি ছিল ২৫, ব্রিটেনের ২ থেকে ৩ এর মধ্যে। আজ উল্টোটি ঘটছে। এর ফল পৃথিবীব্যাপী বেড়ে চলা দূষণ আর সম্পদের যথেচ্ছ মাত্রা মানব সভ্যতাকে ধংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। আশ্চর্য এশিয়া জুড়ে সেই ইয়োরোপীয় প্রযুক্তির আনুগত্যময় অনুগমন চলছেই। অর্থনীতির আগ্রাসন বিষয়ে যতটা সচেতনতা প্রযুক্তি নিয়ে ততটাই নিশ্চেষ্টতা।

এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে আমরা ব্রিটিশপূর্ব বাংলা বুঝতে চেষ্টা করব। পলাশি চক্রান্তের

আগেও বাংলার সমাজে (ভৌগোলিকভাবে বৃহত্তর বাংলা বলতে পূর্বে বার্মা সীমান্ত, উত্তরে অসম, দক্ষিণে ওড়িশা, পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ বা বঙ্গের দ্বার, দ্বারভাঙ্গা) বড় পুঁজি সমাজ-রাষ্ট্রের সার্বিক নীতি নির্ধারণ করার অবস্থায় ছিল না। তার চলাচলে কিছু সামাজিক বিধিনিষেধ ছিল। এক উৎপাদক অন্য উৎপাদকের উৎপাদন পরিকাঠামো কিনে নিতে পারত না - শিল্পবিপ্লবীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন কোন উৎপাদক না চাইলেও তার ব্যবসা অন্য উৎপাদক কিনে নিতে পারেন হোস্টাইল টেকওভারএর মাধ্যমে - বড় পুঁজি আরও বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে তার থেকে পাঁচগুণ বড় কোম্পানি কিনে নিয়ে তা সামলাতে না পেরে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয় - এ তত্ত্ব-তথ্য খুব সম্প্রতির ইতিহাসে প্রমানিত। কৃষককে, গ্রামের বংশ পরম্পরার ছোট উৎপাদকেদের যদি পুঁজি-নিরপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ ধরি, রাষ্ট্রের মদতে সেই লাভের (কৃষিকে শুধু লাভজনক উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে গিয়ে কৃষির কর্পোরেটাইজেশন ঘটছে, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে) উৎপাদন-ব্যবসাকে জোর করে সারা বিশ্বজুড়ে দখল করা হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে। সেটা পুঁজি-নিরপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার নীতি ছিল না, আজও নেই। কোন আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ফেরিওয়ালা তার পাশের কয়েকটা দোকান, বা ছোট উৎপাদক তার গ্রামের অন্যান্যদের উৎপাদন পরিকাঠামো অবলীলায় আজও কিনে নিয়ে বড় পুঁজি, কর্পোরেট পুঁজি হয়ে উঠতে পারেন না।

উৎপাদন, বিতরণ আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বড় পুঁজির চিরন্তন শত্রু - তাই তাঁর উদ্যম বিশাল বৈচিত্রময় স্থানীয় উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থা ধ্বংস করে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থা তৈরি করা। এই বৈচিত্রময় উৎপাদন-বিবরণ পুঁজি-নিরপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার জোরের জায়গা। সে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ, শ্রম, জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি, বাজার নির্ভর করে উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থা তৈরি করে। তাঁর জোর নিজ সমাজ বিকশিত জ্ঞান, দক্ষতা আর বংশপরম্পরায় তৈরি করা পরিকাঠামো। তার জোর ধারের জ্ঞান, প্রযুক্তি বা দক্ষতার নয়, নিজস্বতার।

ভারতবর্ষ এবং স্বাভাবিকভাবে বাংলা তার বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতির ধারক হকার কারিগর চাষী নির্ভর বহুকাল ধরে বহু কৃষি ও শিল্প উৎপাদন সারা বিশ্বে একচেটিয়া ব্যবসা করে এসেছে - নীল থেকে ইস্পাতের মণ্ড পর্যন্ত - তখন জ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তি তার নিজস্ব ছিল। তার জোরে ১৮০০ পর্যন্ত সে ছিল ব্যবসায় উদ্বৃত্তের দেশ। বড় পুঁজির (এমন কি ছোট্ট হকার বা ফেরিওয়ালার প্রথম বিবরণ পাই জাতকে সেরিবা-সেরিবান গল্পে - সে অন্তত ২০০০ বছরের ইতিহাস) বিতরণ ব্যবস্থা সে উৎপাদনগুলি নিয়ে বিদেশে গিয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দাঁত ফোটাতে পারে নি। সুশীল চৌধুরী, প্রসন্নন পার্থসারথি, ওম প্রকাশ, পেড্রো মাচাডো তাঁতি আর তাঁত বস্ত্র বিষয় গবেষণা বলছে, পলাশীর আগে পর্যন্ত তাঁতিরা ব্যবসায়ীদের দাদন ফিরিয়ে দিতে পারতেন - তাঁদের রোজগার ছিল ইওরোপের তাঁতিদের তুলনায় অনেক বেশি, তাঁরা সারাবিশ্বজুড়েই ব্যবসা করতেন। নীল উৎপাদন-বিতরণ ব্যবস্থাই ধরা যাক, ২০০০ বছর আগে রোমে ভারতীয় নীল যেত - নাম ইন্ডিগো - উৎপাদনের ভৌগোলিকতার সূত্র ধরে - নীল লাতিন আমেরিকা থেকেও সে সময়ের ইওরোপে আসত - তারও নাম ছিল কিন্তু ইন্ডিগো - এই প্রায় একচেটিয়াসম ব্যবসাকে ১৮০০ সালের পর রাষ্ট্রের মদতে, বড় কর্পোরেট পুঁজি, উৎপাদক-বিতরকদের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে দখল - ধ্বংস করল। অথচ অন্তত ২০০০ বছর ধরে নানান ধরণের কৃষি বা শিল্প উৎপাদনের একচেটিয়া ব্যবসা করেও কেন্দ্রিয় দখলদারির, চাষীদের নিংড়ে লাভের শেষ কপর্দক তুলে নেওয়ার নীলকর তৈরি হয় নি। ম্যাঞ্চেষ্টারের অতিরিক্ত উৎপাদনের কাপড় মিলগুলি লাভ করতে ততদিন

পারে নি, যতদিন না বন্দুকের মুখে দাঁড় করিয়ে ভারতের আড়ংগুলি ধ্বংস করা হয় নি, নীল চাষ-ব্যবসা দখল করা হয় নি, ইওরোপে বাংলার কাপড়ের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক বসে নি, ইওরোপে ইস্পাতের (ধাতুর) কারখানা চলে নি যতদিননা ভারতবর্ষ ব্যপ্ত ৩০০০০ চলন্তিকা ছোট্ট গলনচুল্লির ধারক-বাহক, দেশের ছোট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ ডোকরা উৎপাদকদের ধ্বংস করা হয় নি - এই ইস্পাত মণ্ড দিয়ে এক সময় বিশ্ববিখ্যাত দামাস্কাস তরোয়াল তৈরি হত বা বাংলার ব্রিটিশপূর্ব সময়ে বানানো প্রচুর লোহা/ধাতু সামগ্রী আজও আকাশের তলায় পড়ে থাকে মরচে বিহীন হয়েই।

আর্যভটের হাত ধরে আরও হাজারো গুণীর চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণমুক্ত কলন বিদ্যার ফলিত জ্ঞানচর্চা তাঁতিদের, নাবিকদের, চাষীদের হাতে প্রতিকূলতা জয় করার করার সুযোগ করে দিয়েছিল, বাংলা তথা ভারতের বিশিল্পিয়ায়নের ব্রিটিশ উদ্যমে সেই ব্যপ্ত কেন্দ্রবিহীন ভারতজোড়া বিদ্যাচর্চাকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ধ্বংস করা হল, ইওরোপে গিয়ে সেই মুক্ত প্রাথমিক জ্ঞানচর্চা হয়ে উঠল উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থার অংশ - যারা সেই জ্ঞানচর্চাকে দখল করলেন তাঁরা তখন সেটির ওপরে পেটেন্টের ঘোমটা পরাতে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলা তথা ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম ধারক বসন্তের টিকাকারদের নিষিদ্ধ করে জেনারের উদ্ভাবিত টিকা ব্যবস্থাকেই চালাতে হয়েছে।

দেশজ প্রযুক্তির চরিত্র

ছোট্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণে থাকে প্রযুক্তির প্রয়োগ। পলাশীপূর্ব কারিগর হকার চাষী ব্যবস্থা জানার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটা বড় উপাদান। প্রযুক্তি কার নিয়ন্ত্রণে, এই তত্ত্ব-তথ্য আলোচনা ব্যতিরেকে, ব্রিটিশপূর্ব বাংলাকে জানার প্রচেষ্টার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে বোঝা প্রয়োজন প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ আদৌ উৎপাদকের হাতে রয়েছে কি না। অর্থাৎ যে প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সে উৎপাদন করছে, তা বড় পুঁজির কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত কি না। মোটা ভাষায় বলা যায়, কাজ করতে করতে প্রযুক্তির হাতিয়ারগুলি বিকল হলে সে নিজে বা স্থনীয়ভাবেই সেটা সারিয়ে নিতে পারে কিনা, না তাঁকে সমাজের বাইরের ওপর নির্ভর করতে হয়। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলার শাঁখারিদের শাঁখের করাত উপহার দিয়েছিলেন বর্ধমানের কামারেরা। তাঁরা এমনভাবে সেই করাত তৈরি করেছিলেন যাতে সেটি বংশপরম্পরায় ব্যবহার করা যায়, নিজেরাই সেই করাত ধার করে নিতে পারেন - কামারদের ওপর যাতে নির্ভর না করতে হয়। অশ্লীল সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা দখলদারি পেটেন্ট নেওয়ার কথা তুলছিই না।

শিল্পবিপ্লবের আগে থেকেই কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণযুক্ত বড় পুঁজি চেষ্টা করেই যাচ্ছে প্রযুক্তি, জ্ঞানচর্চা পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রয়োগ করে দখলে নিয়ে আসতে। উদ্দেশ্য সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দখলদারি নিশ্চিত করা। উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র বিচারে আমাদের প্রাথমিক প্রশ্ন প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে, পুঁজির চরিত্র কি - সে অন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কন্সোলিডেশনের নাম করে, উন্নয়নের নাম করে সমাজের সম্পদ দখল করার ছাড়পত্র পায় কি না।

অন্য সভ্যতার কথা জানি না, দক্ষিণ এশিয়া মূলত শূদ্র বৈশ্য মুসলমান এবং অন্যান্য পরম্পরার হকার কারিগর চাষীদের সমাজের তৈরি সভ্যতা - জ্ঞানচর্চা, উৎপাদন বিতরণ ব্যবস্থায় তাদের নিয়ন্ত্রণহীন পকড় নতুন ভাবে ভারতকে বসিয়েছিল বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থায়। কারিগরদের হাতে ছিল দেশের মূল উৎপাদন বিতরণ ব্যবস্থা - তাঁরাই তৈরি করেছিলেন এই ব্যবস্থার দর্শন। কয়েক হাজার বছর ধরে শূদ্ররা, বৈশ্যরা, মুসলমান, আদিবাসীরা নিজেদের

বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন দর্শন তৈরি করেছিলেন - যে দর্শনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে গিয়েছে ইওরোপ ২৫০ বছর ধরে। পলাশির পর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বিশিল্পিয়ায়ন, জ্ঞানচর্চা ধ্বংস, লুঠ, খুন ব্যবস্থা নামিয়ে এনে সেই দর্শন ধ্বংস বাস্তবে রূপ পায়, তা চরম রূপ ধারণ করেছে স্বাধীনতার পর - তার জন্য কয়েক কোটি গ্রামীন শূদ্র বৈশ্য মুসলমানকে উচ্ছেদ করতে হয়েছে - সে লড়াই চলছে আজও। তবুও রক্তবীজের বংশধরেরা তাদের মত করে দেশের গ্রাম উৎপাদন ব্যবস্থা ধারণ করে রয়েছেন বলেই বিশ্ব মন্দা ভারতে প্রভাব ফেলে না, নোট বন্দীর মত গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসমূলক পরিকল্পনাও শেষ অবধি ধ্বংস হয়ে যায়।

তাই আজকের বাংলার ব্রিটিশপূর্ব বাণিজ্য চর্চা আলোচনার কাজে প্রাথমিকতা হওয়া দরকার পুঁজির চরিত্র আর প্রযুক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করা। শিল্পবিপ্লবীয়(যে উদ্যম আদতে নব্য দাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে - যার সঙ্গে বিপ্লবনামক বহুব্যাপ্ত ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দটির কোন সম্পর্ক নেই) সময়ে যে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটল, চরিত্রের দিক থেকে সেগুলি কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রযুক্তির চরিত্র এমন, শুধু প্রযুক্তির জ্ঞানচর্চা বিক্রি করে অনন্ত লাভ করা যায়। পশ্চিমে বিকশিত প্রযুক্তির বড় প্রযোগবাদিতা ছিল সামরিক বিদ্যা বিকাশে - আর্কিমিদিস থেকে গ্যালিলিও থেকে নিউটন থেকে ওপেনহাইমার, বোর পর্যন্ত পশ্চিমি প্রযুক্তি বিকাশের ইতিহাস তাই বলে। জনগনের অর্থে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গবেষণাগারে বিকশিত সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে মূলত বিশ্বজোড়া সম্পদ লুঠের কাজে, মানুষের মন নিয়ন্ত্রণের কাজে। কেন্দ্রিভূতভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য পশ্চিমি প্রযুক্তির মূল চরিত্র লুঠেরার। শ্রমের যাতায়াত কোথায় উন্মুক্ত হল? ইওরোপ, আমেরিকার [আজও ইওরোপের উপনিবেশ] অভিবাসন আইনেই বোঝা যাবে। বিশ্বায়নের যুগে বড় পুঁজির বাজার উন্মুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে - যেখানে সে পারে নি, সেখানে অস্ত্রের ব্যবহার করেছে।

তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক প্রতিজ্ঞা

প্রাথমিকভাবে বাংলা তথা ভারত তথা এশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা শিল্পবিপ্লবীয় এককেন্দ্রিক সামাজিক দর্শনের থেকে আলাদা ছিল। এই সামাজিক ব্যবস্থা মূলত বড় পুঁজির প্রতিস্পর্ধী অবস্থান। সামাজিক সাম্যের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া। একে সামাজিক ব্যবসাও বলা যায়। আজকে লুঠেরা কর্পোরেট পুঁজিকে ঠেলেঠুলে যে কাজ করানো যাচ্ছে না - সেই আদ্যিকালের যুগে - যে যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে দাগিয়ে দিতে পশ্চিমি জ্ঞানচর্চকদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না - বণিকেরা বাংলায় সব থেকে বেশি জনপূর্তির পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা হয়ত জানতেন সেই বিনিয়োগ উৎপাদন-ব্যবসার কাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

ব্রিটিশপূর্ব বাংলার সামাজিক শিল্প-ব্যবসার বিষয়ে খুব বেশি কাজ হয়েছে কি না বলা যাবে না। আন্তভারতীয় বা আন্তএশিয়া ব্যবসা নিয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে - কিছুটা গিল্ড বা কারিগর শ্রেণী নিয়ে হয়েছে - কিন্তু সে প্রচুর পুরনো সময়ের - সেখানে বাংলা ভিত্তিক আলাদা করে কোন কাজ হয়েছে বলে জানা নেই। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, সুশীল চৌধুরী বা তপন রায়চৌধুরীর আকবরের সময়ের কাজ বা অঞ্জলী চ্যাটার্জীর আওরঙ্গজেবের সময়ের বাংলা বইতে বিদেশিদের চোখে বাংলার ব্যবসার কিছু ওপর ওপর কাজ ছাড়া বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। যা হয়েছে ইওরোপিয়দের সঙ্গে বাংলা/ভারতের যোগাযোগের দিন নিয়ে - প্রচুর ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। সমস্যা হল, যারা উপনিবেশিক ইতিহাস লিখলেন তাঁরা যেমন উপনিবেশের, তার অর্থনীতির গুণ গাইতে তার মাহাত্ম্য তৈরি করলেন, আবার বিরোধীরা - যেমন উপনিবেশিক তত্ত্বের বিরোধীরা - নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা দাদাভাই নৌরজী

বা রমেশ দত্ত (উপযুক্তভাবেই) লুঠের তত্ত্ব খাড়া করতে উপনিবেশিক সময়কেই ধরলেন - আজকের বাংলার বাইরে পটানা - বৃহত্তর বাংলা নিয়ে কাজ করেছেন কুমকুম চ্যাটার্জী 'মার্চেন্টস পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি মডার্ন ইন্ডিয়া'য়। যদিও ইওরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসার পরিমান ছিল মাত্র ১০ শতাংশ - বাকি ৯০ ভাগ এশিয় এবং দেশিয়। আর ইওরোপ বলতে ব্রিটিশ বুঝলাম। পর্তুগিজেরা যে ভারতে মুঘলদের আগে এসেছিল সেই হার্মাদদের ব্যবসা ব্রাত্য হয়ে গেল - তাদের সঙ্গে ব্যবসার ইতিহাস ধরতে পারলে কিন্তু ইংরেজি ১৪০০ সালের শেষের দিকের বাংলার ব্যবসার একটা দিক পাওয়া যেত। ব্রিটিশদের নিয়ে কাজের বাইরে দারুণ গবেষণা করেছেন ইন্দ্রাণী রায়, ওম প্রকাশ, সুশীল চৌধুরী ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচে ব্যবসা নিয়ে। তাদের মূল ঘাঁটি ছিল বাংলাতেই। তাই ব্রিটিশ ছাড়া ডাচেদের কথা পাই - বিশেষ করে পলাশীর আগে তাঁরা কিভাবে কাজ করতেন, কিভাবে স্বাধীনভাবে তাঁতিরা কাজ করতে পারতেন, দাদন ফিরিয়ে দিতে পারতেন তা অসম্ভব নতুনত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন এই দুজন। শ্রীলা ত্রিপাঠি বলছেন হিপ্পালাসের মৌসুমী বায়ু 'আবিষ্কার'এর আগে থেকেই বাংলার নাবিকেরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেত - যার রেশ আজও থেকে গিয়েছে ওডিশার বালি যাত্রা উতসবে, বাংলার নানান ব্রতে, উতসব মেলায় - গুজরাটের নাবিকেরা লোহিত সাগর এবং আফ্রিকায় - প্রসন্নন পার্থসারথি, জর্জিও রিয়েলো বা পেড্রো মাচাডোরা দেখিয়েছেন গুজরাটি ৩০০০ বছরের পুরনো বস্ত্র ব্যবসার কুড়।

আগেই বলেছি, ইওরোপ-ভারত ব্যবসার পরিমান ছিল মূল উৎপাদনের ১০ শতাংশ মাত্র, বাকি এশিয় আর দেশজ বাণিজ্য, আফ্রিকিয় বিশেষ করে গ্রিস আর মিশরের সঙ্গে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বিপুল বাণিজ্য হত, তা নিয়ে আলোচনা কোথায়? গবেষণা নিবদ্ধ হয়েছে মূলত জামাকাপড় আর মশলা ব্যবসায়। এমন এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে, এই বাণিজ্যের বাইরে আর কিছু খুব একটা লাভজনক পণ্য ছিল না। কিন্তু সোরা থেকে নুন থেকে তামাক থেকে সুপুরি থেকে লোহা থেকে চাল থেকে কাঁসা, আরও কি না কি ছিল বিশাল রপ্তানির পণ্য - একদা বাংলা থেকে উৎপন্ন হয়ে গুজরাটের যে বন্দর হয়ে বিপুল পরিমান সুপুরি আরব দেশ অথবা লেভন্ট এলাকায় যেত যে সেই পণ্যের নাম থেকে বন্দরের নামই হয়ে গেল সোপারা। হেস্টিংস সে তিনটি পণ্য প্রথম একচেটিয়া ব্যবসার অধীনে আনেন সেগুলি হল তামাক, সুপুরি আর নুন - বস্ত্র বা আফিম বা মশলা নয়।

এ নিয়ে যোগ্য আলোচনা দরকার। সমস্যা হল পদ্ধতি নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেলেভাজার অর্থনীতিকে জোরদার করার কথা বলে জোর গাল খেয়েছেন ডান-বাম উভয়ের থেকেই অথচ উপনিবেশপূর্ব বাংলার অর্থনীতিটা ছিল ছোট উৎপাদন কারিগর, হকার, চাষীর তৈরি উৎপাদন ব্যবস্থাভিত্তিক। গবেষকেরা, অধ্যাপকেরা মনে করেন বড় কারখানা না হলে তা অর্থনীতি নয়, যেমন বাংলাদেশে আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু মাটির বাড়ি, মাটির মসজিদ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শুনেছেন মাটির বাড়ি/মসজিদকে কবে থেকে স্থাপত্য ধরা হল? সেই শিক্ষা মেকলের পৌত্র/পৌত্রীরা পেয়েছেন ইওরোপের শিল্পবিপ্লবীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে। অথচ যতদিন নিজেদের অর্থনীতি, নিজেদের প্রযুক্তি, নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ততদিন বাংলা ছিল বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের দেশ। পলাশীপূর্বের ৫০ বছরের আলোচনা ঠিক এই জন্যে জরুরি, বাংলা কেন উদ্বৃত্ত অর্থনীতি ছিল এটা জানা বোঝার জন্যে।

সামাজিক গণতন্ত্র ও সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার নয়া ইস্তেহার

শমীক সাহা

আলোচনার পরিসর

এই ইস্তেহারের আলোচ্য বিষয়গুলো কারো মৌলিক রচনা নয়। বহু মানুষের সাথে বহু আলোচনায় এই ভাবনা উঠে এসেছে। তাঁরা সবাই একটি সংগঠনে সামিল হবেন এরকম আমরা ভাবছিও না, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও ব্যক্তির মননে এই ভাবনা চিন্তাগুলি সক্রিয়তা তৈরি করবে। বস্তুত এই রকমের বহু আলোচনা বেশ কিছুদিন ধরে, বিভিন্ন পরিসরে ও ফেসবুকে চলছে এবং বহু মানুষ অংশগ্রহণ করছেন। তাঁদের বহু মতামত ইতোমধ্যেই আলোচনায় সংযুক্ত হয়েছে। সেই কারণেই এই আলোচনা কারো ব্যক্তিগত মতামত নয়, সমষ্টির বক্তব্য। সবাই হয়তো সব বিষয়ে সহমত নন, কিন্তু বহু বিষয়ে সমমনস্ক ও একই পথের পথিক। এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার দরকার আছে এবং এই ইস্তেহার রচনা কারও একার কাজ হতে পারে না, বহু মানুষের সম্মিলিত যোগদানেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব। কোনও একজনকে মূখ্য কলমচির দায়িত্ব নিয়ে সকলের সমমনস্কতার পরিসরটুকুকে চিহ্নিত করতে হয়, আমি আপাতত সে দায়িত্ব পালন করছি। আগ্রহী সব মানুষের সাথে আলাপ চালানোর আশাতেই এই প্রস্তাবনা। তাই আশা করাই যায় খুব শিগগিরি এই প্রস্তাবনা আরও বহু মানুষের কথন হয়ে উঠবে। এই ধারণাগুলোকে পাথেয় করে এক বা একাধিক সংগঠন গড়ে উঠবে কিনা তা সময় বলবে। বহু সংগঠন ও ব্যক্তি এই আলোচনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাই নতুন বহুত্ববাদী সংগঠন গড়ে ওঠার যথেষ্ট আশাও আছে। এই প্রস্তাবনা যৌথতার রূপরেখা এবং ভারতীয় সমাজের বহুমাত্রিক বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের আলোক বর্তিকা।

এই ইস্তেহার অসম্পূর্ণ, কারণ গোটা একটা মতবাদ লিখে ফেলার চেষ্টাতে সায় নেই। 'সম্পূর্ণ সমাধান'এর খোঁজ আদতে কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা, আমরা তার বিরোধী, এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চলার পথে এই প্রস্তাবগুলো ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকবে - এটাই বাস্তব। সেই অংশীদারিত্বের পরিসরই এই ইস্তেহারে রাখা হচ্ছে, তাই এই অসম্পূর্ণতা এবং এটাই শক্তি।

আমাদের বক্তব্য আমাদের ভাষায়

আমাদের দেশ কেমন? কী অবস্থায় আছে আমার দেশ? আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ? এই বিষয়ে কথা বলতে গেলেই প্রায় শতাব্দী প্রাচীন কতগুলো শব্দ সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া আরও হাজার গণ্ডা বিশেষণ আমাদের জিভে এসে ভিড় করে এবং প্রায় সবই নেতি বাচক। এই শব্দগুলো বা তাকে কেন্দ্র করে জারিত তত্ত্ব সমূহকে কোন আক্রমণ করতে চাই না, সেই তত্ত্বগুলোর নিজেদের মধ্যেই অন্তহীন আকচা-আকচি চলছে জন্মের সময় থেকেই, আপাতত এগুলো আমাদের তেমন কোন কাজে লাগবে না, আমরা চেষ্টা করবো সাধারণ মানুষের লব্জ ও ভাষায় আমাদের সমাজকে বুঝতে।

দুনিয়া না থাকলে কোথায় আপনি আর কোথায় আমি!

এক সর্বভুক আত্মঘাতী সমাজে আমরা এখন বসবাস করছি। উন্নয়নের নামে বিগত ২৫০ বছর ধরে কতিপয় মানুষ যে মুনাফার পাহাড় বানিয়েছে, তাদের আর তাদের চ্যালা-চামুণ্ডাদের কর্মকান্ডে দুনিয়া আজ টলোমলো। এক সময় মানুষ ভয় পেয়েছিল পারমাণবিক

যুদ্ধে বোধ হয় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ বোঝা যাচ্ছে - পরিবেশ প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তার নাশকতার মাত্রা পারমাণবিক যুদ্ধের থেকে বেশি বৈকি কম নয়। পৃথিবীর গহ্বরে খনিজের ভান্ডার প্রায় শেষের মুখে, হিমবাহ গলে ছোট হয়ে গেছে। সমুদ্র তলের উচ্চতা বাড়ছে , বহু অঞ্চল শিগগিরই চলে যাবে সাগরের গ্রাসে। কোভিড১৯ অতিমারি বুঝিয়ে দিয়েছে এই ধরণের সংক্রমণ ক্রমাগত বাড়বে। কোভিড-১৯ একটি জুনোটিক ভাইরাস, অর্থাৎ এই ভাইরাসের থাকার কথা অন্য প্রাণীর দেহে, সেই ধরণের প্রাণীর সাথে মানব সমাজের কিছুটা দূরত্ব থাকার কথা, কিন্তু কার্যত এই দূরত্ব ঘুঁচে গেছে, তাই কোভিড-১৯ ভাইরাস মানুষকে আক্রান্ত করেছে। মানুষ এত বেশি প্রাণীকে তাদের স্বাভাবিক আবাস স্থল থেকে উৎখাত ও উত্যক্ত করছে যে তাদের শরীরে বেঁচে থাকা জীবানুগুলো বাধ্য হয়ে মানুষের শরীরে আশ্রয় পেতে চাইছে। সারা দুনিয়া জুড়ে অজস্র ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট - পৃথিবীর ভাঁড়ার প্রায় নিঃশেষিত। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ চুষে ছিবড়ে করে দিয়ে কিছু মানুষ আশ্রয় নেবে নিরাপদ ক্যাপ্সুল বাঙ্কারে অথবা পাড়ি দেবে মঙ্গল গ্রহে; আপনাকে আমাকে আগামী প্রজন্মকে ছেড়ে দেবে সুমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার জন্য বা খরায় শুকিয়ে মরার জন্য। দুনিয়া রসাতলে পাঠিয়ে এক দল মানুষ আপনার আমার আগামী প্রজন্মের মৃত্যু পরোয়ানা টানিয়ে দিচ্ছে ভবিষ্যতের দেয়ালে।

তাহলে কি ঐ সব মুনাফাখোরদের নিকেষ করে দিলেই দুনিয়ায় শান্তি সুস্থিতি ফিরে আসবে? মোটেই তা নয়। এই মুনাফাখোরীর ব্যবস্থাপনা শুধু জল আকাশ বাতাসকেই বিষিয়ে দেয়নি, বিষিয়ে দিয়েছে আপনার আমার মনন চিন্তন স্বপ্ন সম্ভাবনা। তাই রাক্ষস নিধন করেও রেহাই নেই। দেখা যাবে সেই নিধনের পরেও আরও বেশি রাক্ষস জন্ম নেবে আপনার আমার ভিতর থেকে। তারও উদাহরণ আছে আপনার আমার আশেপাশেই। যথা সময়ে সেই আলোচনাও হবে।

তাই নতুন রাজনৈতিক পথের খোঁজ শুধু অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যার সমাধান খোঁজা নয়, সুস্থ মননের খোঁজও বটে। বিবেক বাদ দিয়ে মানুষ আর মানুষ থাকে না। বিবেক বললেই অনেকে ভাববাদী গন্ধ খুঁজে পান - মনে করিয়ে দিই - আপনার মন মগজেই থাকে আপনার শরীরের বাইরে থাকে না। তাই বস্তুবাদী আলোচনাও বিবেক বর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

কেন এই ইস্তেহার

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা সর্বত্র পিরামিডের উলম্ব কাঠামো। সর্বত্র মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শীর্ষ অধিকার করে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বঞ্চিত করছে ন্যায্য অধিকারে। বিপরীতে এই পিরামিড কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের সাংগঠনিক কাঠামোও পিরামিড আকৃতি। সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই শীর্ষ নেতা ও সাধারণ কর্মীর মধ্যে যথেষ্ট উলম্ব দূরত্ব বজায় রেখে চলে। নিজেদের ভিতরের পিরামিড বজায় রেখে অন্য পিরামিডের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় কি? নাকি এই লড়াই শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়, পিরামিডের শীর্ষ দখলেরই লড়াই। পিরামিডের নীচের তলার বঞ্চিতরা বঞ্চিতই রয়ে যায় শেষমেশ, শুধু শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হয় ক্রমাগত। পিরামিড ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই পিরামিড বিহীন অন্য কোন আকার নিতে পারে কি? রাজনীতি কি হাঁটতে পারে নতুন কোন প্রকরণে? সেই নতুন রাজনৈতিক প্রকরণের খোঁজই এই অসম্পূর্ণ ইস্তেহার।

আমরা চাই ইতিবাচক রাজনীতি

[প্রচলিত রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ধারাগুলিতে কেন আস্থা রাখছি না, তা নিয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় সব রাজনৈতিক ধারা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহীরা পড়ে নিতে পারেন।]

প্রায় সব রাজনৈতিক ধারা বক্তব্যের শুরুতেই এক বা একাধিক শত্রুকে চিহ্নিত করে এবং বলে সেই শত্রুকে পরাস্ত করতে পারলেই সুদিন আসবে। আমরা মনে করি এই পৃথিবীতে কোন মানুষ কারো শত্রু হয়ে জন্মায় না। পারিপার্শ্বিকতায় শত্রুতার জন্ম হয়, শত্রুতা সব পক্ষকেই শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে, শত্রুতা এই সমাজে কোন রকম ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। শত্রুতাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষা-গত, জাতি-গত, শ্রেণী-গত বা অন্য যে কোন তকমা এঁটে সংগত প্রমাণ করার চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ এই শত্রুতার পরিমণ্ডলে শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের লাভ হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইতিহাসে এরকম হাজার নিদর্শন আছে।

প্রতিপক্ষকে শত্রু বলে দাগানো আসলে সমস্যা বাড়ায়। খেয়াল রাখতে হবে - প্রতিপক্ষ আর শত্রু এক নয়। যে কোন দ্বান্দিক অবস্থানে আমার সাথে যার কোনও রকম দ্বন্দের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সে আমার প্রতিপক্ষ হতে পারে, কিন্তু তাকে আমি শত্রু দাগিয়ে দিতে পারি না। আমরা ইতিবাচক রাজনীতি করতে চাই, কাউকে শত্রু দাগিয়ে দিলে সে আমার ইতিবাচক মনণ পরিসীমার বাইরে চলে যাবে। চলার পথে নানা রকমের বাধা আসবেই, সে বাধা প্রাকৃতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত যে কোনও রকমের হতে পারে বা আরও হাজার রকমের বাধা হতে পারে। আমরা যদি প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানের নীতি মান্য করি, তাহলে মানুষকে শত্রু দাগাই কোন নৈতিকতায়? আর কাউকে শত্রু দাগানো মানে, তার সহযোগীরাও শত্রু হয়ে যাবে। তারপর সহযোগীর সহযোগী তার সহযোগী এভাবে শত্রুর দল ভারী হবে ক্রমাগত। অর্থাৎ শত্রুর সাথে সংযুক্ত সবাইকেই আমরা ক্রমে শত্রু দাগাতে থাকবো, শেষ মেশ দেখা যাবে শত্রুরাই সংখ্যায় ভারি। আসলে কাউকে শত্রু দাগিয়ে দেয়া এক কদাকার ফাঁদ, এই ফাঁদে পড়লে সমাজ শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন হবে। বিচ্ছিন্ন মানুষ সমাজে কোনও ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। আমরা এভাবে ভাবার চেষ্টা করবো - আমরা যে ভাবে ভাবছি, সবাই আমাদের মত করে ভাববে না। যত বেশি সম্ভব মানুষকে আমাদের বিভিন্ন কাজে জুড়ে নিতে হবে। আমাদের কাজই বহু সংখ্যক মানুষকে আমাদের সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করবে। আগামী সময় নির্ধারণ করবে - আমরা কার্যকরী কিনা।

আমরা দুনিয়াকে শত্রু বনাম মিত্র এরকম সাদা কালো রঙে বিভাজিত করবো না। আমরা এমন রাজনৈতিক চর্চা শুরু করতে চাই যেখানে মতের বিভিন্নতা কখনোই মানুষকে বিপন্ন করবে না। বিপরীত মত বা বিপরীত পথ আলোচনার অন্তরায় হয়ে উঠবে না। পরমত সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সহাবস্থান আমাদের রাজনৈতিক চর্চার ভিত্তিভূমি হোক। আমরা কখনোই বলবো না আমাদের পথই একমাত্র পথ, কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাষায় বলবো আমরা মানুষের ভালো বলতে কোন মানুষদের কথা বোঝাচ্ছি এবং ভালো থাকার সূচকগুলো আমাদের কাছে কী কী। অর্থাৎ আমাদের রাজনীতি ইতিবাচক রাজনীতি, কোন এক পক্ষকে নিকেশ করে বাকি মানুষদের মঙ্গলকামনা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা মানতে রাজি নই যে - দুনিয়া শুধুমাত্র শোষক আর শোষিত এই দুভাগেই বিভক্ত, আর শোষকদের নিকেশ করতে পারলেই সবাই খুব ভাল থাকবে।

এই মানব সমাজ অত্যন্ত বৈচিত্রময় জটিল ব্যবস্থাপনা, এই বৈচিত্র ও জটিলতা মানব সমাজের সম্পদ, এই জটিলতা ও বৈচিত্রকে ধারণ করেই আগামীর পথ খুঁজতে হবে।

কোথাও কোনও গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের মেডইজি নেই যা পরশপাথরের মত কাজ করবে এবং সব সময় সঠিক দিশায় আমাদের পরিচালিত করবে। বরং আমাদের স্বীকার করে নেয়া ভাল - আমরাও কিছু ভুল করতে পারি, কিন্তু বেশিরভাগ কাজ ঠিক করবো এবং নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নেবো, পাশাপাশি অন্যান্য যে মতবাদের যা কিছু শিক্ষনীয় তা থেকেও শিখতে চেষ্টা করবো।

আমরা আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক সংগঠন দেখেছি, তারা সবাই বলে - তারা যদি সরকার গড়তে পারে তাহলে ভাল কাজ করবে। আমরা বলছি, মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারে যাওয়াটাই প্রাথমিক শর্ত নয়। আমরা শুরুর দিন থেকেই সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমেই বহু সমস্যার সমাধান করতে পারবো, মানুষের পাশে থাকতে পারবো। যথাস্থানে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এরকম কোনও পথ নেই যা দেশের সব মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাই আমরা গোড়াতেই বলে দিতে চাই কোন কোন সমস্যাগুলির সমাধানের পথ আমরা খুঁজতে চাইছি।

- প্রকৃতির সাথে মানুষের সুষ্ঠু সহবাসের পরিস্থিতি তৈরি করা। প্রকৃতির পূরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা। যাতে প্রকৃতির সম্পদ নিঃশেষিত না হয়।
- প্রাকৃতিক সম্পদকে সামাজিক সম্পদে পরিনত করা।
- সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে মানুষের স্বাধীন স্বনির্ভর সামাজিক যৌথ জীবন যাপনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কমিয়ে আনা। সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।
- ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, সমাজের সাথে সমাজের এবং ব্যক্তির সাথে সমাজের সংহতি বিকশিত করা। প্রতিটি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।
- সমাজের বিকাশ সামাজিক উদ্যোগে করতে হবে। সমাজের অর্থনীতি, রীতিনীতি, নৈতিকতা, মানবিক বিকাশ, নিরাপত্তা, সংহতি, বিয়োজন, সমাপন এই সবই যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সামাজিক উদ্যোগে করতে হবে। বস্তুত আজও আমাদের সমাজে এর বেশিরভাগটাই মূলত সামাজিক উদ্যোগেই হয়। রাষ্ট্র ক্রমাগত এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসতে চাইছে। আমাদের কাজ এই সামাজিক উদ্যোগগুলিকে বিকশিত করা এবং সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করা।

আমরা কী দেখছি

সমাজ গড়ে ওঠে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আর উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে প্রকৃতির বৈচিত্রকে কেন্দ্র করে। নদী অববাহিকায় কৃষি ভিত্তিক সমাজ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, কারণ নদীর পলি মাটি কৃষির উপযোগী আর কৃষিকে কেন্দ্র করে জীবন আবর্তিত হলে প্রতিদিনকার যাপনে, আচারে, উৎসবে, পরবে, সংস্কৃতিতে কৃষিকেন্দ্রিক বিভিন্ন উপাদান থাকবে। আবার রুক্ষ মালভূমি অঞ্চলে সেখানকার প্রকৃতি নির্ভর জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

আজ এই প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাপনকে ছাড়খাড় করে দিচ্ছে বৃহৎ শিল্পায়ন। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে শিল্পায়নের নামে, জল জঙ্গল জমি পাহাড় নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীগুলি উৎখাত হচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শিল্পায়নের কর্মযজ্ঞ সমাজে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে? শিল্পায়নের নামে খনি রেল সড়ক ড্যাম নগরায়ন ইত্যাদি দিয়ে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদকে দখল করা হচ্ছে তাতে কত সংখ্যক মানুষের জীবন জীবিকার

সংস্থান হচ্ছে? পরিসংখ্যান কী পাওয়া যাচ্ছে?

Press Information Bureau Government of India Ministry of Labour & Employment ২৫ জুলাই ২০১৬ তে জানাচ্ছে - As per the result of labour force survey on employment and unemployment conducted in 2011-12 by National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, the number of estimated employed persons in 2011-12 on usual status basis were 47.41 crore, of which 82.7% of workforce (39.14 crore persons) was in unorganized sector. এই আনঅর্গানাইজড সেক্টর বলতে বোঝান হয়, যে উদ্যোগে ১০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে, এবং শ্রমআইনের আওতাভূক্ত নয়। এই ৮২.৭ শতাংশের বাইরে আছে, কৃষক, ক্ষেত মজুর।

ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের শিল্প বিপ্লব গোটা দুনিয়ায় এক বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল - এই বৃহৎপুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থাই একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা। এর বাইরে বেঁচে থাকার কোনও উপায় নেই। সব মানুষকেই কাজের জন্য - বৃহৎপুঁজির দুয়ারে এসেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ভারতের মানুষ হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে - আমাদের ১৪০ কোটির দেশে শিল্পায়ন দিয়ে আর যাই হোক কর্মসংস্থান হয় না। মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ মানুষকেও কর্মসংস্থান করতে পারেনি শিল্পায়নের নামে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। আর এই বৃহৎপুঁজির প্রযুক্তির উন্নয়নের মূলমন্ত্রই - কত কম লোক দিয়ে কত বেশি উৎপাদন করা যায়। তাই আগামীতে বৃহৎশিল্পে কর্মসংস্থান ক্রমাগত কমবে, বাড়বে না। অথচ সেখানেই যাবতীয় সরকারি ভর্তুকি, ট্যাক্সে ছাড়, সহজে ঋণ, ঋণ মকুব, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার।

আমরা মনে করি বৃহৎপুঁজির কলকারখানা যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালায়, তাতে কী উৎপাদন হয়, তার মান কেমন সেটা দিয়ে যদি সেই শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা মাপতে হয়, তাহলে আমরা ভুল করবো। কারণ সেই পণ্য সমাজে যা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বা সেই কারখানার শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থনীতিতে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তার যোগফল তুচ্ছ হয়ে যাবে যদি আমরা হিসেব করতে বসি - এই কারখানা প্রকৃতিতে কী কী ক্ষয় করেছে, শ্রমিকের কত শ্রম শোষণ করেছে, কত বিপুল পরিমাণ সামাজিক জ্ঞানকে কুক্ষিগত করেছে পেটেন্ট মারফত।

এই প্রকাণ্ড শিল্পায়নের গৌরবগাথা গাওয়ার পরেও সব বড় কারখানা, চটকল, সুতাকল, কাপড়ের মিল, আরো অজস্র মহাকায় ইন্ডাস্ট্রি তার সাথে রেল, সামরিক বাহিনী, সব সরকারি কর্মচারি সব মিলিয়ে কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ১৭ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নেয়। তাই অর্গানাইজড সেক্টর কত টাকার ব্যবসা করে, কত 'উন্নত' পণ্য বানায় তা দিয়ে আমরা এই ব্যবস্থাপনার উপযোগিতা মাপবো না। সরকারি পরিভাষায় যারা আনঅর্গানাইজড সেক্টর তারাই এই দেশের ৮৩ শতাংশ কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নেয়। তাই আমরা আনঅর্গানাইজড সেক্টরকেই ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা বলে মানবো এবং সে উৎপাদন ব্যবস্থাকে জানা বোঝা ও বিকশিত করার চেষ্টা করবো। যে ব্যবস্থাপনা ৮৩ শতাংশ কর্মসংস্থান করে সেই ব্যবস্থাপনাই সামাজিক বিকাশের উপযোগী, আমরা সোচ্চারে তার পক্ষে। কিন্তু আমরা সরকারের দেওয়া অচ্ছেদ্দার নামকরণ 'আনঅর্গানাইজড সেক্টর' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করবো না, আমরা বলব কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা। পরবর্তী আলোচনায় আমরা বোঝার চেষ্টা করবো এই কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি, তার বৈশিষ্ট্য ও শক্তির জায়গাগুলো কী? কেন কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা মানব সভ্যতাকে বিকশিত করতে পারে, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই।

প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব রাজনীতি

আমাদের রাজনীতি প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব। উপনিবেশিক রাজনীতি ও শিল্প বিপ্লব গত তিনশ বছরে দুনিয়া জুড়ে প্রকৃতিকে যে ভাবে ধ্বংস করেছে, তা যদি চলতে থাকে, তাহলে মানব সভ্যতার বিলুপ্তি অনিবার্য। বৃহৎপুঁজির ধ্বংসাত্মক শিল্পায়নের বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ আমাদের করতেই হবে। প্রকৃতির সাথে মানুষের ইতিবাচক সহাবস্থান গড়ে তোলা ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের কাজ। অনেকেই পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলনকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে পিছনের সারিতে রাখেন। আমরা মনে করি, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গোটা কয় গাছ লাগিয়ে দায় সারা যাবে না। খুব স্পষ্ট বক্তব্য -

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অন্ন সংস্থানের জন্য সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। একটা নদীর জলে কারখানার বর্জ মিশে দূষিত হলে কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়। একটা বনাঞ্চল উজাড় হলে কয়েক হাজার মানুষের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ভোটে জেতা ক্ষমতা দখল করা মন্ত্রী হওয়া এগুলোর কোন উপযোগিতাই থাকবে না যদি পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষের বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক রসদগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে রক্ষা করার জন্যই পরিবেশের ভারসাম্যের প্রশ্নকে সবার আগে রাখতে হবে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার কোন পথে সবচেয়ে ভালো ভাবে করা যায়, সেই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তির মুনাফার পাহাড় বানানোর ফিক্সডডিপোজিট হতে দেওয়া চলবে না।

একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার - শিল্পবিপ্লব যে উৎপাদন ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে, তা মূলত খনিজ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা। আগে গোটা পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল মূলত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদ নির্ভর। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বস্তু একবার ক্ষয় হয়ে গেলেও তা আবার পূরণ করা যায়, কিন্তু খনিজ একবার ক্ষয় হয়ে গেলে তা পূরণ করার কোনও উপায় নেই। আর এই খনি অঞ্চলগুলো হয় ঘন লোক বসতি থেকে অনেকটা দূরে। ফলত দেশের বড় অংশের মানুষের কোনও ধারণাই থাকে না, সেই খনি অঞ্চলগুলোতে কী বিপুল পরিমাণ প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। খনিজ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা আমাদের এক নিঃস্ব ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খনিজ ভান্ডার শেষ হবেই। নিঃশেষিত খনিগুলোর অতলস্পর্শী রিক্ত গহ্বরগুলো যারা দেখেনি, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না ধরিত্রীর বুকে সে ক্ষতস্থান কতটা অসহনীয়।

আমরা খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই - বৃহৎশিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা আসলে অসামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা। তাতে পুঁজিপতি ও তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়তে পারে, তাদের উৎপাদনে ভোক্তাদের আপাত কিছু আরাম মিলতে পারে, কিন্তু এই উৎপাদন প্রকৃতি ও মানব সমাজের যে বিপুল ক্ষয় করছে, তা পূরণ করার কোনও উপায় নেই।

প্রাকৃতিক সম্পদকে সামাজিক সম্পদে পরিনত করাই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে মানুষের সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমরা কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থাকেই উপযোগী বলে মনে করি।

হচ্ছিল রাজনীতির কথা মাঝখান থেকে কারিগরি উৎপাদনের আলোচনায় ঢুকে পড়লাম কেন?

মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ - গণতন্ত্র। গণতন্ত্রর জন্য সব থেকে বড় বিপদ হল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। ভারতের মত বৈচিত্রময় সুবিশাল দেশে ক্ষমতার

কেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। কারণ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সরলরৈখিক প্রশাসনিক কাঠামো চায়। বৈচিত্রময়তা সব সময়েই সরলরৈখিকতাকে ব্যাহত করে। তাই কেন্দ্রীয় ক্ষমতা চায় - বৈচিত্র যেন তার কর্তব্যকে বাঁধা না দেয়। তাই বৈচিত্রকে সে সীমায়িত করতে চায় - এক দেশ, এক আইন , এক ভাষা। অথচ আমরা আলোচনার শুরুতেই বলে ছিলাম - ভারতীয় সমাজের বৈচিত্রময়তাই তার সব থেকে বড় সম্পদ। তাই বৈচিত্রকে রক্ষা করতে গেলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার।

আমরা যদি জনগণের কল্যাণের সব দায়িত্ব সরকার তথা রাষ্ট্রকে দিয়ে দিই, তাহলে রাষ্ট্রও জনগণের জীবনে অযাচিত নাক গলাবে, গনতন্ত্র বিনষ্ট হবে। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র থাকবে অথচ তার পিরামিড আকৃতির শাসনতন্ত্র থাকবে না, আমলাতন্ত্র থাকবে না, স্বজনপোষণ থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না এমন সম্ভব নয়। জনগণ যত রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষি থাকবে রাষ্ট্রও ততটাই জনগণের মাথায় চড়বে। নেতা মন্ত্রীদের দৌরাত্মও ক্রমাগত বাড়বে। এই বিষচক্রকে ভাঙতে গেলে - জনগণকে রাষ্ট্র নির্ভরতা কমাতে হবে।

রাষ্ট্র খুব সহজ কথায় বলতে গেলে - দারোয়ান। যার কাজ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়া, নিরাপত্তা দেওয়া। আমরা ভুল করে তাকে খাবার ঘরে বা শোবার ঘরের কাজ করতে দিচ্ছি বলেই ঝামেলা বাড়ছে। রাষ্ট্র তৈরিই হয়েছিল জনগণকে নিরাপত্তা দেবার জন্য। একদিকে রাষ্ট্রের হাতে UAPA, AFSPAর মত ভয়ঙ্কর অস্ত্র তুলে দিয়ে আমরা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকছি। অন্যদিকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য শিক্ষা এই যে মূল পাঁচটা কাজ সেগুলো নিয়েই রাজনৈতিক দলগুলো যাবতীয় ফেরেব্বাজি চালিয়ে যাচ্ছে -

● কেউ বলে দুটাকায় চাল দেবে কেউ বলে পাঁচটাকায়, অথচ গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাই কর্পোরেটের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র করে দেবার যাবতীয় আয়োজন প্রায় সারা।

● উন্নত তুলোচাষের নাম করে প্রচণ্ড জল খেকো বিদেশী বীজ আর রাসায়নিক সার সর্বস্ব এক বিকট ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। যার পরিনামে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে। কাপড়ের কারখানাগুলোও দূষণ আর শ্রমশোষণের মজবুৎ ঠিকানা।

● বাসস্থানের নাম করে ধনীদের প্রমোদকানন বানানো হচ্ছে, যার স্থাপত্য একেবারেই আমাদের দেশের উপযোগী নয়। এই ধরণের কাঁচে মোড়া স্থাপত্য অসম্ভব বেশি বিদ্যুৎ আর জল খায়। বড়লোকের ঘরে লিফট পাম্প এয়ারকন্ডিশনার চালানোর বিদ্যুৎ যোগান দিতে গিয়ে কয়লা খাদানের গ্রাসে আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ হবে কেন? এই উঁচু বাড়িগুলোর জল যোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভের জলস্তরে ডাকাতি চলছে।

শিক্ষার নামে চলছে লোভের আগুনে ঘৃতাহুতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য লোককথাতেই স্পষ্ট - লেখা পড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। ছাত্ররা শিক্ষা পাচ্ছে - কাদা মেখে মাঠে চাষ করার চেয়ে কৃষিদপ্তরের আধিকারিক হওয়া ঢের বেশি সাফল্য। (বিশদ আলোচনা - শিক্ষার নামে চিটিংবাজি, পচা ছাত্রের দুচার কথা - নামের প্রবন্ধ দুটিতে পাবেন।)

● জল হাওয়া বিষিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্য কাঠামো উন্নতি করে কিইবা হবে! একদিকে উন্নয়নের নাম করে অসুখ ছড়ানো হবে অন্য দিকে হাসপাতাল খুলে হবে বাণিজ্য। চিকিৎসাবিদ্যাকেও কুক্ষিগত ও বাণিজ্যভিত্তিক করে ফেলা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা মারফত।

আমাদের বক্তব্য হল মানুষের মূল চাহিদা - অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই বিষয়গুলোকে যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের থেকে দূরে রাখা ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই চাহিদা ও সমস্যাগুলির সমাধান করা। এই যে বলা হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের থেকে দূরে গিয়ে সামাজিক উদ্যোগের উপর নির্ভর করা, এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কারিগরি

উৎপাদন ব্যবস্থা। আমরা মনে করি কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্র নির্ভরতা কমায়, সামাজিক উদ্যোগকে প্রসারিত ও সংহত করে।

পুঁজি কেন্দ্রীভূত হলে অসাম্য বাড়ে, জনগণের বিপদ বাড়ে। পাশাপাশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলেও বিপদ। রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী করতে গিয়ে সমাজ রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়ে যাচ্ছে। নিজের দেশের সরকার বা অন্য দেশের সরকার যার অধীনস্থই হোক না, অধীনতা সবসময়েই সমাজকে পঙ্গু করে, উপনিবেশে অবনত করে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নাম করে ক্ষমতা ও পুঁজিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা, তা গণতন্ত্রের নামেই হোক আর সমাজবাদ বা সাম্যবাদের নামেই হোক, শেষ পর্যন্ত তা মানুষের ক্ষমতা হরণ করে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল পঙ্গু মানুষের পঙ্গু সমাজ তৈরি করবে।

কারিগরি উৎপাদন কী? কারিগর কারা?

একটা বড় গাড়ির কারখানার একজন কর্মী সব রকমের কাজও যদি জানে (যদিও বাস্তবে জানতে দেওয়া হয় না) তাহলেও ঐ পরিকাঠামো ছাড়া গাড়ি বানাতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যক্তির দক্ষতার থেকে পরিকাঠামো এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরি উৎপাদন ঠিক এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে। কারিগরি উৎপাদন মূলত দক্ষতা নির্ভর, পরিকাঠামো নির্ভর নয়। কোনও কোর্স করে, সিলেবাস মুখস্থ করে কারিগর হওয়া যায় না। যে কোনও কোর্স বা সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশুনাতে কী হয়? একজন পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করে, তারপর শিক্ষক বা অধ্যাপক হয়ে তিনি তার অর্জিত জ্ঞান বিক্রি করেন। কারিগরি ব্যবস্থা ঠিক এর বিপরীতে অবস্থান করে। বস্তুত কারিগররা তাদের অর্জিত জ্ঞান বিক্রি করে না, তাদের অর্জিত বা উদ্ভাবিত প্রকৌশল কুক্ষিগত করে না, কারিগরি প্রকৌশলে জ্ঞানের মালিকানার (পেটেন্ট) কোন ধারণাই নেই বরং কারিগররা তাদের চ্যালাদের প্রশিক্ষিত করে, কাজ শেখায়। কাউকে কোন কাজ শিখিয়ে পয়সা নেওয়া কারিগরি উৎপাদনের দস্তুর নয়, বরং জ্ঞানের প্রবাহকে ক্রমাগত পরিশিলিত করে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়াই কারিগরি ব্যবস্থাপনার মূল শক্তি। ঠিক এই কারণেই কারিগরি উৎপাদন সামাজিক উৎপাদন, কারণ তা সামাজের সহস্রাব্দ অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রকৌশল দক্ষতাকে কোন মালিকানাধীন করে না। মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অর্জন হল - জ্ঞান, কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থায় জ্ঞান সর্বজনীন সামাজিক মালিকানায় থাকে।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনও কাজ শেখার জন্য কোনও কোর্স করায় ভরসা করে না, বরং কোথাও কাজ করতে করতেই কাজ শেখায় বেশি ভরসা করে, সরকারি মতে এরা অপ্রশিক্ষিত কর্মী, কারণ এদের কোন সার্টিফিকেট নেই, এরা যে কোথাও কোন ভাবে কাজ শিখেছে তার কোন প্রমাণপত্র নেই। সরকারি মতে যারা অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তারাই দক্ষ কারিগর। বরং আমরা বলব - কারিগরী দক্ষতা মাপার মত কোন সার্টিফিকেশন পদ্ধতি রাষ্ট্র এখনও বানিয়ে উঠতে পারেনি। রাষ্ট্র একজন কর্মীকে মাপতে চায় ব্যবস্থা অনুমোদিত সার্টিফিকেট দিয়ে, কাগজ দিয়ে; অর্থাৎ সেই মানুষটি কোন কোর্সের মাধ্যমে কোন সার্টিফিকেট পেয়েছে। কাগজে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী লেখা আছে সেটাই সরকারি মতে ব্যক্তির যোগ্যতার প্রামান্য মাপকাঠি। বিপরীতে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের দক্ষতা কাগুজে নয়, তাদের বেঁচে থাকা টিকে থাকার দরকারেই সে দক্ষতা অর্জন করে নেয়। দক্ষতা অর্জন না করতে পারলে বহু ক্ষেত্রেই সে স্রেফ মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়বে, সেখানে কোন কাগজের কোন দাম নেই। যে রঙ মিস্ত্রী, মাটি থেকে ৪০-৫০ ফুট উঁচুতে বাঁশের ভাড়ায় উঠে কাজ করছে, তার আত্মবিশ্বাস যোগান দেয় তার

নিজস্ব দক্ষতা, আজ পর্যন্ত এমন কোন কাগজ ছাপা হয়নি, যা ঐ কারিগরকে আত্মবিশ্বাস যোগাতে পারে। যে জেলে উত্তাল নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরছে সে প্রতিদিন মৃত্যুর কাছে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখে চলেছে, সে কেন কাগুজে সার্টিফিকেটের পরোয়া করবে! ধানের ক্ষেতে ফসল যখন পেকে আসে, কৃষিজীবী মানুষ ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়, সতর্ক দৃষ্টিতে খেয়াল রাখে বৃষ্টি আসতে পারে কি না, কারণ তখন বৃষ্টি হলেই ফসলের ক্ষতি হবে। প্রজন্ম বাহিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, মুখে মুখে বেঁচে থাকা ক্ষণার বচন কৃষিজীবী মানুষকে আবহাওয়া অনুমান করতে পথ দেখায়। এই দক্ষতাকে কোন সার্টিফিকেট দিয়ে মাপা যাবে? তাই একজন গাড়ি কারখানার কর্মী শ্রমিক, কারণ ঐ কারখানা পরিকাঠামো নির্ভর, ব্যবস্থা নির্ভর, ব্যক্তিগত দক্ষতা নির্ভর নয়, মেশিনের সাথে মেশিন হয়ে ওঠাই কারখানায় দক্ষতার পরিচয়। তাই মানুষকে ঐ কারখানার ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ নিয়ে, পয়সা দিয়ে বিদ্যা কিনতে হয়, কিন্তু যেদিন ঐ প্রযুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, সেদিন ঐ সরকারি মতে 'প্রশিক্ষিত দক্ষ' শ্রমিকও বাতিল হয়ে যাবেন। যেমন একসময় টেলিফোন অপারেটরের খুবই চাহিদা ছিল, তার ট্রেনিং কোর্স ছিল আজ প্রযুক্তির বদলের ফলে পরিকাঠামো বদলেছে তাই সেই বিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষিত মানুষগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আজ সেই সার্টিফিকেটের কোনও দাম নেই। তাই বলা যায় - যেহেতু সরকারি মতে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ 'অপ্রশিক্ষিত' অথচ কার্যক্ষেত্রে তারাই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ তাই এই দেশের এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মানুষই কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন ও এরাই আমাদের রাজনৈতিক সাথী। এদের পেশা মূলত কৃষি আরও একটা বড় অংশ কারিগর, মিস্ত্রী, ঠিকা মজুর, পরিবহন শ্রমিক ও আরও অনেক কিছু; অনেকের ক্ষেত্রেই একাধিক পেশা, যেমন অনেক ছুতোর মিস্ত্রী কৃষি কাজও করেন। তাই যদি কোন পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে এই মানুষদের নিয়েই করা দরকার; কারণ গোড়াতেই পরিষ্কার করে দেওয়া যাক - রাজনৈতিক দলের বিচারের মাপকাঠি - 'বেশিরভাগ মানুষের বিকাশের পক্ষে কতটা সহায়ক'।

রাজমিস্ত্রি দলের হেডমিস্ত্রী, যে ১০ জন মিস্ত্রী যোগাড়ে নিয়ে কাজ করে, সেই হেড মিস্তিরি এবং তার দলের ১০ জন সবাই আমাদের রাজনৈতিক সাথী। এদের সবাইকে নিয়েই লড়াই। আমরা জানি হেডমিস্তিরি তার অধীনে কাজ করা মিস্তিরির প্রাপ্য টাকা থেকে কিছু টাকা কেটেও রাখে। হ্যাঁ এখানে লভ্যাংশ আছে, সুতরাং শ্রম শোষণও আছে, তবুও আমরা এই কারিগরি ব্যবস্থার পক্ষেই দাঁড়াচ্ছি ও এই ব্যবস্থায় যুক্ত সকলকেই আমাদের রাজনৈতিক সাথী বলেই মনে করছি। এখানে মনে হতে পারে, শোষক ও শোষিত একই সাথে কী করে রাজনৈতিক সাথী হতে পারে? আমরা কেন কারিগরি উৎপাদনের শ্রম শোষণ কে সমস্যা বলে মানছি না, তা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তাই যে রাজনৈতিক ধারার পক্ষে বলবো তাকে বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী কোন বিশেষণ দেওয়া হবে তা, নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। যে যা খুশি অভিধা দিতে পারেন আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা অপেটেন্টকৃত সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর কারিগর ও কৃষকদের পক্ষেই দাঁড়াবো।

আজকের বৃহৎপুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা - শিল্পবিপ্লব। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব গোটা দুনিয়াকে প্লাবিত করেছে। প্রতিটি দেশের অর্থনীতি রাজনীতি সামাজিক ভারসাম্য শিল্পবিপ্লবের পণ্যপ্লাবনে জারিত হয়ে আগেকার সব ব্যবস্থার বিপ্রতিপ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপুল পণ্য উৎপাদন কী ভাবে সম্ভব হল তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন দার্শনিক অর্থনীতিবিদ প্রযুক্তিবিদ সহ আরও বহু মানুষ। আমরা তাদের বক্তব্যের কাঁটাছেড়া না করে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে নজর দিতে চাই। আমরা শিল্পবিপ্লবজাত

সভ্যতাকে নাম দিতে চাই তুবড়ি সভ্যতা।

যে কোনও শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল মূলত তিন রকমের - উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ, খনিজ(হাওয়া ও জলকে খনিজর সাথে যুক্ত রাখছি) শিল্পবিপ্লবের আগে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হত - উদ্ভিজ্জ ও প্রানীজ বস্তু, খনিজের ব্যবহার ছিল সীমিত। শিল্পবিপ্লবে কাঁচামাল হিসেবে খনিজের ব্যবহার সব থেকে বেশি শুরু হল। এর আগে যন্ত্রের চালিকা শক্তি ছিল মানুষ বা পশুর কায়িক বল এবং কিছু ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহ, জলপ্রবাহ (হাওয়াকল, জলযান)। শিল্পবিপ্লবে যান্ত্রিক শক্তির উৎস হল প্রথমে খনিজ কয়লা তারপর খনিজ তেল, যাকে এককথায় বলা হয় - জীবাশ্ম জ্বালানি।

জীবাশ্ম জালানীতে প্রকাণ্ড পরিমান শক্তি পাওয়া গেল যা যন্ত্রকে দিল দূর্বার গতি। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানীতে এই শক্তি এল কোথা থেকে? কয়লা তৈরি হয়েছে উদ্ভিদের অবশেষ থেকে পেট্রোলিয়াম প্রাণীর অবশেষ থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রকৃতি থেকে উপাদান নিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল; বিপূল পরিমাণ প্রকৃতিক শক্তি লক্ষ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হয়েছিল এদের দেহে। তারপর তারা মাটির নিচে চাপা পড়ে ভূগর্ভের বিপূল পরিমান তাপ ও চাপকেও সঞ্চিত করেছে লক্ষ বছর ধরে। এই লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত শক্তিকে আমরা ব্যয় করেছি মাত্র আড়াইশো বছরে। ব্যাপারটা প্রায় তুবড়ি বাজির মত, বহুক্ষণ ধরে বানিয়ে মুহূর্তে জ্বলে উঠে শেষ, তাই উজ্জ্বলতা বেশি, জৌলুস বেশি। আমাদের এই বিদ্যুৎ নির্ভর সভ্যতাকে যদি তুবড়ি সভ্যতা বলি, বোধহয় খুব ভুল হবে না। কারণ একটা তুবড়ি জ্বললে দারুণ আলো হয় ঠিকই, কিন্তু তার আয়ু কয়েক সেকেন্ড। এবার আমরা যদি চাই তুবড়ি জ্বালিয়ে ঘর আলো করবো তাহলে ক্রমাগত তুবড়ি জ্বালিয়েই যেতে হবে। তাতে ধূলো ধোঁয়া বিষাক্ত গ্যাসের চোটে ঘরের দশা যা হবে, সেটা আর বসবাসের উপযুক্ত থাকবে না। বাস্তবত দুনিয়া জুড়ে আমরা এটাই করছি। গোটা দুনিয়াটাই আজ ধূলো ধোঁয়া বিষাক্ত গ্যাসে জর্জরিত, সত্যিই আজ এই তুবড়ি সভ্যতার চোটে দুনিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ।

সেই কারণেই - গ্লোবাল ওয়ার্মিং, হিমবাহ গলছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে, ঘূর্ণি ঝড় বাড়ছে, কলকাতা ডুবুডুবু। ক্লাইমেট এমার্জেন্সি। গ্রেটা থুনবার্গ। ফ্রাইডে ফর ফিউচার। দূষণ কমানোর আন্তর্জাতিক অঙ্গিকার। বিশদে জানতে চাইলে এ বিষয়ে বহু লেখা আছে। আমাদের লেখা - দেউচা পচামি ও সুশীল সমাজের গুডমর্নিং - এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা বলছি - এই সঙ্কটের থেকে বাঁচার উপায় হতে পারে কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা। কী ভাবে? সে আলোচনায় ঢোকার আগে একটা জরুরি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক -

পণ্য উৎপাদন কী অনন্ত?

পণ্যের কী কোন উর্ধ্ব সীমা হতে পারে? হ্যাঁ পারে। পৃথিবীতে কোন প্রাকৃতিক সম্পদই অনন্ত নয়। প্রাকৃতিক সম্পদই তো কারখানা মারফত পণ্য হয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকছে। তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদ যদি সীমাবদ্ধ হতে পারে, তাহলে পণ্য কেন সীমায়িত হতে পারে না? শুনতে খুব আজব লাগছে? আমার পকেটে পয়সা আছে, তাহলে আমি কেন খুশি মত পণ্য কিনতে পারবো না! না ক্ষমতা থাকলেও সব কিছু যত ইচ্ছে কেনা যায় না। আমাদের দেশেই আইন আছে - ল্যান্ড সিলিং এক্ট। এই আইনের বলে নির্ধারণ করা আছে আপনি কোন উদ্দেশ্যে সর্বাধিক কতখানি পর্যন্ত জমি কিনতে পারেন। এই আইনের উদ্দেশ্য কী?

দেশের জমি সীমায়িত, তাই কেউ যাতে অত্যাধিক জমি দখল করতে না পারে, প্রত্যেক নাগরিক চাইলে যাতে অন্তত কিছুটা জমি কিনতে পারে সেই অধিকার বজায় রাখার জন্যই ল্যান্ড সিলিং এক্ট। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় - চাল, বেবিফুড, মদ আরও অনেক কিছু কেনার উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হয়। তাহলে কত সম্পদ একজন মানুষ বা কোন সংগঠন আয়ত্ব করতে পারে, সেই সংক্রান্ত সীমারেখা টানার আইন কেন আমাদের দেশে থাকবে না? মানবতার খাতিরে, প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার জন্য সম্পদ আহরণের উর্ধ্বসীমা নির্ধারন জরুরী। প্রকৃতির কোন সম্পদই অসীম নয়, তাই পণ্য তথা সম্পদ আহরণও সীমায়িত হওয়া উচিত। এই সীমা নির্ধারণ হবে কী ভাবে?

কোন কারখানায় কোন পণ্য খুব বড় সংখ্যায় উৎপাদন হয় কখন? যখন উপভোক্তার সংখ্যা উৎপাদক জানে না। যখন উৎপাদক মনে করে তার উৎপাদন অজানা অচেনা বহু মানুষ ব্যবহার করবে। উৎপাদক জানেনই না তার পণ্যের উপভোক্তার সংখ্যা কত? অর্থাৎ উৎপাদক অবস্থান করছেন কেন্দ্রে আর উপভোক্তারা তাকে কেন্দ্র করে চারপাশে ঘিরে আছেন। বহু সংখ্যক পণ্য বহু পরিমাণ মুনাফা তৈরি করে, তা থেকে উলম্ব অর্থনীতির পিরামিড তৈরি হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থাই অর্থনীতির পিরামিড তৈরি করে।

আজকের পণ্য প্লাবনের গোড়ার কথাই হল - অজানা উপভোক্তার জন্য অসংখ্য উৎপাদন। মনে করা যাক দুটি কোম্পানি সাবান উৎপাদন করে। কারো কাছেই কিন্তু এরকম কোনও তথ্য নেই ঠিক কতজন তাদের সাবান কিনবে। এক কোম্পানি ভাবছে তারা ১০ লক্ষ সাবান বেচবে, অন্য কোম্পানি ভাবছে ১২ লক্ষ সাবান বেচবে। এই ১২ লক্ষ সাবানের খরিদ্দারের খোঁজে তারা সারা দেশের সর্বত্র বাজার ধরার চেষ্টা শুরু করলো। এই বাজারের দখলের জন্য এবার শুরু হবে প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতা কোন দিন সুস্থ হতে পারে না। বিজ্ঞাপনে মিথ্যের ফুলঝুরি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে কাজে লাগানো পর্যন্ত সবই তারা করবে। প্রয়োজনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেশের আইন পর্যন্ত বদলে দেবে। এই বাজার দখলের প্রতিযোগিতাই অধিকাংশ সামাজিক অশান্তির মূল কারণ।

এবার ঠিক উলটো দিকের একটা অতি পরিচিত ছবি, যা আমরা আমরা রোজ দেখি, সেটাকে আলোচনায় আনা যাক -

আপনার পাড়ার মিষ্টির দোকানের ট্রেতে একেকটা মিষ্টি কতগুলো সাজানো থাকে? ৫০ থেকে ১০০ বা ২০০। কোনও বিশেষ উৎসবের দিনে আর একটু বেশি। কোনও খরিদ্দার আলাদা বরাত দিলে, আর একটু বেশি। কেন তারা হাজার হাজার মিষ্টি বানিয়ে আরও বড় বাজার ধরার চেষ্টা করে না? আজকাল কিছু কিছু মিষ্টির দোকান শাখা বানিয়ে বিক্রি করছে, তাতেও তাদের বৃহৎপুঁজিপতির সাথে তুলনা করা যায় না এবং তারা কোনও দিনও বৃহৎপুঁজিপতি হয়ে উঠতে পারবে না। কেন? কারণ তাদের এমন কোন USP নেই যা অন্য কোনও মিষ্টির দোকান নকল করতে পারবে না। কারণ মিষ্টি তৈরি প্রকৌশল পেটেন্ট করা যায় না। তাই একচেটিয়া বাজার দখল করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মিষ্টি একটি কারিগরি উৎপাদন। আজ কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান যন্ত্র দিয়ে মিষ্টি বানালেও তা করিগরি উৎপাদন। কারণ প্রকৌশলে কারও মালিকানা নেই। প্রকৌশল শিখে যে কেউ ছোট বড় আয়োজনে মিষ্টি বানাতে পারবে। স্যামসাং-এর সাথে অ্যাপেলের পেটেন্ট যুদ্ধ, লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডার বনাম মাকালী মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্যামসাং ও অ্যাপেলের পেটেন্ট আছে মিষ্টির কারিগরির নেই। এক মিষ্টি বিক্রেতা যদি নতুন কোনও মিষ্টি বানায়, দেখা যাবে অন্য মিষ্টি বিক্রেতাও কদিন পরে সেই মিষ্টি বানাতে শুরু করবে। কিন্তু মিষ্টির দোকানদার তার নিজের নির্মাণ কৌশলকে পেটেন্টবদ্ধ করার ঝামেলায় যাবে না। কারণ সেই

পেটেন্ট নেয়া, তার তদারক করা, যদি কেউ বেআইনি উৎপাদন করে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া, এই পুরো ব্যাপারটায় যা খরচ বা মেহনত হবে তত টাকার লোকসান তার হবে না। এই কারণেই কারিগরি উৎপাদন রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষি নয়। রাষ্ট্রীয় আইনের রক্ষাকবচ তার প্রয়োজন হয় না। কারিগরি উৎপাদন আঞ্চলিক তাই পরিবহণের উপর সে কম নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর উপর কম নির্ভরশীল।

সুস্থ সমাজের জন্যই পেটেন্ট বিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা তথা কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা দরকার। তাই উৎপাদন হতে হবে আঞ্চলিক। অঞ্চলের মানুষের জন্য অঞ্চলের উৎপাদক ও তার সীমিত উপভোক্তা। তাহলেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় বিশ্বযুদ্ধ লাগানোর প্রয়োজন ফুরোবে। উৎপাদনের একচেটিয়া ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের পাহারাদারিও কম হবে।

অলীক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে? তাহলে শতাব্দীবাহিত কারিগরি উৎপাদনগুলো, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জড়িয়ে জাপ্টিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে একটু চেনা যাক।

দেখরে নয়ন মেলে, জগতের বাহার

আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল কারিগরি ক্ষেত্র কী সেটা বোঝা, তার বিভিন্ন শক্তিগুলোকে খুঁজে দেখে তার সামাজিক প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করা। আমাদের বুঝতে হবে উৎপাদন বলতেই আমাদের মনে যে দৈত্য-সম যন্ত্রের বিরাট কারখানার ছবিটা ভেসে ওঠে তার বাইরেও কত রকমের উৎপাদন আমাদের চোখের সামনে রোজ হচ্ছে, আমরা খেয়াল করছি না।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের মূল যে উপাদানগুলো লাগে - অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই ক্ষেত্রগুলির কোনটাই মূলত মেশিন নির্ভর নয়, বস্তুত মানুষের দক্ষতা নির্ভর। যারা এই ক্ষেত্রগুলিতে যুক্ত আছেন তারা এটা সহজেই বুঝতে পারবেন। আর যদি সন্দেহ থাকে যে কোন ক্ষেত্রে গিয়ে প্রক্রিয়াগুলোকে চাক্ষুস করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। এই বোঝার কাজগুলো বই পড়ে করা যাবে না, কারণ কারিগরি উৎপাদন, সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন ব্যবস্থার থেকে এতটাই আলাদা, যে কারিগরি উৎপাদনকে বিবৃত করার মত শব্দ ভান্ডারই অভিধানে নেই। একটু উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হতে পারে - নাশ, আল-বিন্ধ, খাবল, কুরসুৎ, হালট, প্যানা, ব্যানা, নারিশ এই শব্দগুলি ছুতোরেরা প্রতিদিন ব্যবহার করেন, কিন্তু অভিধানে এই শব্দ পাওয়া যায় না। তাই আমাদের রাজনীতি বুঝতে হলেও কারিগরি উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ জুড়তে হবে।

কারিগরি উৎপাদন বিরাট বিপুল ও বৈচিত্র্যময়। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা উদাহরণ দিই বোঝার সুবিধায় -

আমাদের কেনা খাবারের বেশির ভাগটাই ছোট পুঁজির ছোট কারখানায় তৈরি হয় - মিষ্টি, চিড়ে, মুড়ি, খই, মুড়কি, সেমাই, বাতাসা, নকুলদানা, কদমা, ঝোলাগুড়, আখি গুড়, নলেনগুড়, পাটালি, তাল পাটালি, নিমকি, চানাচুর, গাঁঠিয়া, ঝুরিভাজা, ডালমুট, তেলেভাজা, আলুর-দম, ঘুগনি, আলু কাবলি, ফুচকা। শহর মফস্বলের কিছু কর্নফ্লেক্স বা ওট খাওয়া বাবু-বিবি বাদে কত কোটি লোক প্রতিদিন এগুলো খায়, তাতে কত টাকার ব্যবসা হয়, কত লোক কাজ পায় সে হিসেব কোন সরকারী ফাইল আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রে পাওয়া যাবে বলতে পারেন? দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'ফটাস জল' (স্থানীয় কোল্ড ড্রিঙ্ক) আর 'রুটি লাঠি' (কোয়াটার পাউন্ড প্লেন পাউরুটি আর শুকনো ক্রিম রোল) যত লোকের জীবিকা দেয় গুনলে টাটা বাটা বাবুরা ভির্মি খাবেন।

আমাদের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র - হারমোনিয়াম, তবলা, ঢাক, ঢোল, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ,

বাঁশি, ভেঁপু, সানাই, সেতার, সরোদ, সুরবাহার, সুর মন্ডলম, এস্রাজ, সারেঙ্গী আরও হাজার যন্ত্র তৈরি করে কারিগররা, কত লোক এগুলো বানিয়ে বা বাজিয়ে খায়?

আমাদের পোষাকের বেশির ভাগটাই তৈরি হয় কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থায়।

জানি এই অবধি পড়েই অনেকের ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠেছে ব্যাঙ্গের হাসি - এত গৌরচন্দ্রিকা করে শেষমেশ তেলেভাজা শিল্প! তেলেভাজা শিল্পের কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে এলিট মহল। কিন্তু এই এলিট ভদ্রবিত্তরা কোন দিনই টের পাবেন না তারা কতটা কূপমণ্ডুক। তাহলে একটু তত্ত্ব কথা হোক, যে ভাষায় যে বোঝে আর কী।

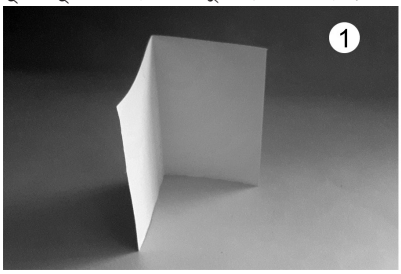

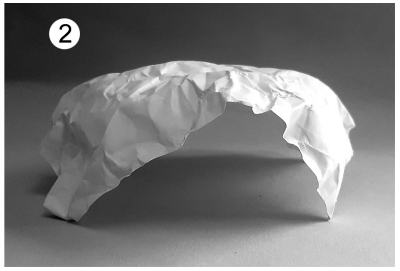

আমরা যদি একটা কাগজ কে খাঁড়া দাঁড় করাতে চাই, কোন ঠেকনা ছাড়া সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, শুয়ে পড়ে। সেটাকে সাধারণ ভাবে দাঁড় করানোর উপায় ১নং ছবির মত। অর্থাৎ কাগজকে মাঝামাঝি একটা ভাঁজ দিয়ে দাঁড় করানো, মেঝেতে তার পায়ের ছাপ পড়বে ইংরাজি 'L' অক্ষরের মত। এটাই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গোঁড়ার কথা, এমন কি আমাদের সাধারণ রাজমিস্ত্রিরাও এটা ভালোই জানে, খালি দেওয়াল দাঁড়াবে না, হয় পিলার লাগাও না হলে 'এল' করে দাও। কিন্তু আরও এক রকম গড়ন হতে পারে। ২নং ছবিটার দিকে দেখুন। একটা কাগজকে দলা-মোচা করা হয়েছে, তার পর একটু ভাঁজ খুলে রাখা হয়েছে। খেয়াল করে দেখুন ওই কাগজটাও একটা ছাউনির আকৃতি নিয়েছে। অর্থাৎ এটাও একটা গড়ন, এটাও একটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এই গড়নটাও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাথে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, এরও ভার বহনের ক্ষমতা আছে। লোড ডিভিশনের অঙ্ক এই গড়নের মধ্যেও খেলা করছে। এটাকে বলা হয় Theory of chaos, আগ্রহ থাকলে খোঁজ করে দেখতে পারেন, স্থাপত্য, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি আরও বহু ক্ষেত্রে এর আলোচনা বিশ্বব্যাপী চলছে।

আমরা সাধারণ ভাবে প্রথম গড়নটাকে ঠিক বলি, দ্বিতীয় গড়নটাকে গড়ন বলে স্বীকার করি না। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাবো, আসলে স্বীকার করি, কিন্তু মানতে চাই না। আমরা চণ্ডীগড়কে বা জামশেদপুরকে প্ল্যান্ড সিটি হিসেবে বাহবা দিই, কিন্তু চোখের সামনেই ২০০০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আনপ্ল্যান্ড সিটি কাশী (বারানসী), তার যাবতীয় অগোছালোপনাকেই সম্পদ করে। আসলে আমাদের গোটা ভারতবর্ষটাই দ্বিতীয় গড়নের ধাঁচে দাড়িয়ে আছে, মেলামেশার অগুন্তি অঙ্ক আর সমীকরণকে আত্মস্থ করে। এটাই আমাদের দেশের এবং সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে, কেউ যদি চায় প্রথম গড়নটাকেই একমাত্র পাথেয় করতে তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় ঘুরছে আধিপত্যের উদগ্র বাসনা। কেন? কারণ সে পছন্দ করছে সরলরৈখিকতাকে, অপছন্দ করছে বিভিন্নতাকে। তার মনের ভিতর গাঁথা আছে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ছবি, যার সব কিছুই সুনির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা এবং সে সেই নিয়মের নিয়ামক হতে চায়। যাবতীয় মানুষের পছন্দ অপছন্দ রুচি স্বভাব বিভিন্নতা সব কিছুকে

নস্যাৎ করে, কোন এক আদর্শকে সে চাপিয়ে দিতে চাইছে সবার ওপর। এই প্রবণতাই স্বৈরাচার। আমরা যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করি, তাহলে মানুষের ভিন্ন রুচি, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন অভ্যাস, ভিন্ন জীবন প্রনালীকে সম্মান করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে এই বিভিন্নতাকে অগোছালপনা মনে হতে পারে, গভীর ভাবে দেখলে এই অগোছালপনার মধ্যেই ছন্দ আছে, সুর আছে, রঙ আছে, রেখা আছে, রূপ আছে, রস আছে। ভারতবর্ষের এই আপাত অগোছালোপনাই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ।

এই আলোচনায় মনে হতে পারে আমরা যদি আমাদের সমাজের অগোছালোপনাকেই ভালো বলে মেনে নিই, তাহলে রাজনীতি করার দরকারটাই বা কি? যেমন চলছে তেমনই চলুক না। কিন্তু না, বিষয়টা আরও একটু বিস্তৃত করলেই বোঝা যাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি? এর পরের আলোচ্য আমাদের রাজনৈতিক পথ, প্রকরণ ও পদ্ধতি।

সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে চাই না

অনেকেই, বামপন্থীরা বিশেষত, রাজনৈতিক আলোচনার সূচনাই করেন সমাজ পরিবর্তনের দাবী দিয়ে। 'এই সমাজ পচে গেছে, একে ছুঁড়ে ফেলে নতুন সমাজ গড়তে হবে ' - এমন ভাবনার মধ্যে যে অকৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকে, তা অজস্র উচ্চমন্যতার জন্ম দেয়, সমাজ থেকে মননকে, রুচিকে বিযুক্ত করে। আমরা যে সমাজে বেঁচে আছি, বড় হচ্ছি তার মধ্যে বৈষম্য নীতি-হীনতা কদর্যতা যেমন আছে তেমনি অজস্র ইতিবাচক উপাদানও আছে। তাই সমাজ টিকে আছে, বিস্ফারিত হচ্ছে না। যারা এই সমাজের কদর্য দিকগুলোতে বিরক্ত হয়ে বলছেন এই সভ্যতা অসভ্যতার নামান্তর, তারা আমাদের সমাজের ইতিবাচক দিকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না, বা দেখতে চাইছেন না, বস্তুত তারা এই সমাজের থেকে রসদ সংগ্রহ করতে না পেরে, সমাজটাকেই ভেঙে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করছেন, এবং ব্যর্থ হচ্ছেন, সমাজ তার নিজ শক্তিতেই নিজেকে টিকিয়ে রাখছে। আমাদের চিনতে হবে সমাজের ইতিবাচক উপাদানগুলোকে যা বারংবার কিছু মানুষ কুক্ষিগত করে শুধুমাত্র নিজেদের বিকাশে ব্যবহার করছে এবং বেশির ভাগ মানুষকে বঞ্চিত করছে। এদের এই চক্রান্তকে আমাদের ভাঙতে হবে, যাতে এই সমাজের ইতিবাচক দিকগুলি এই সমাজের বৃহত্তর অংশকে বিকশিত করতে পারে। সমাজের এই ইতিবাচক দিকগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পদ নয়, মানবিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক সম্পদও বটে।

সমাজের মধ্যে মানুষের পরস্পরের সাথে জুড়ে থাকাকে শুধুমাত্র উপযোগিতা বা প্রয়োজনের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, আবেগ রুচি-বোধ বহু সময়েই মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হয়। এক জন কৃষিজীবীকে যখন যুক্তি দেয়া হয়, সে জমি বিক্রি করে সেই টাকায় ব্যবসা করলে অনেক বেশি টাকা রোজগার করবে, বহু সময়েই সে এই যুক্তিকে বাতিল করে। কারণ বেশি টাকা = ভাল থাকা, এই সমীকরণ যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ তা ঐ কৃষক তার সহজাত বোধ দিয়েই বুঝতে পারে। কৃষির সাথে তার সম্পর্ক শুধু মাত্র খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নয়, সেখানে ফসলের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে আবেগ এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কৃষক যখন জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তখন তার এই আবেগ, সংগ্রামের পক্ষে আবশ্যকীয় ইতিবাচক উপাদান, এই আবেগকে কেউ যদি 'কৃষকের মানসিকতার জড়ত্ব' বলে অভিহিত করেন, তবে আমাদের বুঝতে হবে তিনি আমাদের সমাজের প্রাথমিক গুণগুলিকে চিনতে ভুল করছেন।

আমাদের বুঝতে হবে সমাজ কাদার তাল নয়, যে কুমোরের মত সিদ্ধান্ত নেবো - কোনটা বানাবো ফুলের টব না ভাঁড়। বরং আমাদের সবাইকে সুদক্ষ মালী হতে হবে, আম

গাছকে সতেজ আম গাছ বানাতে হবে, জাম গাছকে ভালো জাম গাছ, যত্ন করে চিনতে হবে, কোনটা শস্যের গাছ আর কোন গাছ জঙ্গলেই থাকা ভালো। সমাজকর্মীদের বুঝতে হবে সমাজের কোন ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা সমাজ বিকাশের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। কোন পূর্ব নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে সমাজকে গড়ে নেবার চেষ্টা অতীতে অনেক হয়েছে, এখনো হচ্ছে, আমরা সমাজ গড়ার চেষ্টার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

একটা সমাজ কেন এবং কখন বদলাবে সেটা খুব কম সময়েই উপযোগিতার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যুক্তি খুব সীমায়িত একটি হাতিয়ার। আবেগ অনুভূতি মানুষের কর্মকাণ্ডের অনিবার্য চালিকাশক্তি। তাই যারা ভাবছেন প্রচারাভিযান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে, উন্নত জীবনের হদিস দেবেন, তারা ভুল করছেন। 'ও শ্যামা-দাস আয় তো দেখি, বোস তো দেখি এখানে, সেই কথাটা বুঝিয়ে দেবো পাঁচ মিনিটে দেখেনে' - সুকুমার রায় তাঁর সুকুমার মন দিয়েই বুঝেছিলেন - ও ভাবে কিছু হয় না। আমি একটু বেশি জানি তাই আমি বলবো, আর ও একটু কম জানে তাই ও সেটা মেনে নেবে, এত সরলরেখায় সমাজ চলে না। বস্তুত খগেণবাবু যা জানেন আর নগেণবাবু যা জানেন, তাদের জানার পরিসরের একটা নিজস্ব মানচিত্র আছে, আর এই জানা বোঝা দিয়ে যতক্ষণ তারা ভূমিকম্প বিহীন ভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন ততদিন তারা মানচিত্রের পরিসীমা বা আকার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু কাল সকালবেলা অফিসে গিয়ে নগেণবাবুর দেখলেন তার টেবিলে জাব্দা লেজার-বুক হঠিয়ে কম্পিউটার থানা গেড়েছে, তখন নগেণবাবুর জ্ঞানের পরিসরের মানচিত্রে নতুন করে ওয়ার্ড, ই-মেল, ডাটা বেস ইত্যাদি ঢুকবে। কিন্তু খগেণবাবুর সাম্রাজ্য বিশেষ পালটাবে না, কারণ তাঁর দশকর্ম ভাণ্ডারে কম্পিউটার এখনো আক্রমণ করেনি। তাই যে রাজনৈতিক কর্মীরা ভাবে - মানুষকে বোঝাতে হবে, মানুষ বোঝে না তাই তারা সচেতন নয়, সচেতন হলেই তারা সঠিক রাজনৈতিক পথ বেছে নেবে, আসলে সেই রাজনৈতিক কর্মীরাই মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন এবং তারা খুব বেশি সফল হবেন না। 'ভ্যানগার্ড অফ প্রলেতারিয়েৎ' হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাটা ছাড়তে হবে।

নতুন রাজনীতির ১. নম্বর শিক্ষা -

মানুষ বোঝে না, আমরা বুঝি তাই আমরা মানুষকে বোঝাবো কোনটা ঠিক , কোনটা উচিৎ - এই বদ অভ্যাসটা সবার আগে ত্যাগ করবো।

বিপ্লব শব্দের আভিধানিক অর্থ - দ্রুত পরিবর্তন। কতটা দ্রুত আর কতটা পরিবর্তন? আজ আমরা দেখছি ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে ধর্মীয় মেরুকরণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ছে, বহু চেনা মানুষকে অচেনা লাগছে, বহু এলাকার জীবন যাপন পালটে গেছে অতি দ্রুত। এতো দ্রুত পরিবর্তন ভাবাই যায় না, একি বিপ্লব? কেউ মানবে না। তাই দ্রুত পালটালেই বিপ্লব হবে না, বরং ধীরে টের না পাইয়ে জনগণের বড় অংশের রুচি বোধকে পালটে দেওয়াও বিপ্লব হতে পারে। যে ভাবে টেলিগ্রাম গেছে মোবাইল ঢুকেছে, আকাশবাণীর যায়গায় এফ এম ঢুকেছে, দূরদর্শনের জায়গায় কেবেল টিভি নিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি। ১৯৮০-৮৮ ঐ সময়ের একটা পরিবর্তনের কথা বলা যায়। ৮০-৮২ সালেও কলকাতা বা তার আশেপাশের খাবারের দোকানে খাবার বা চা খেয়ে ঠোঙা বা ভাঁড় রাস্তায় ফেলাই দস্তুর ছিল, এর পর থেকেই দেখা গেল খাবারের দোকানের সামনে উচ্ছিষ্ট বা অন্যান্য জিনিস ফেলার একটা পাত্র থাকছে, ভাঙা হোক ময়লা হোক একটা কিছু নির্দিষ্ট হচ্ছে। এর জন্য আইন করতে হয়নি, তেমন প্রচারও করতে হয়নি, কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে, নেতা লাগেনি, দল লাগেনি। কেউ বলতে পারেন - সময়ের সাথে সাথে কিছু তো বদলাবেই, কিন্তু সব কিছু তো বদলায় না। সাঁড়াশীটাই আরও নিখুঁত হয়ে প্লায়ার্স বা চলতি কথায় প্লাস হয়েছে, কে রান্না

ঘরে সাঁড়াশীর বদলে প্লায়ার্স ব্যবহার করছেন? সুতরাং খেয়াল করলেই এরকম হাজার গণ্ডা বিষয় চোখে পরবে যেগুলো যুক্তি দিয়ে ভাবলে বদলে যাবার কথা, কিন্তু বদলায়নি, আবার বহু বিষয়ে ভাবতেও পারেননি কিন্তু বদলে গেছে বিলকুল। খেয়াল করুন এই বদলগুলোর পিছনে সব চেয়ে তীব্র যে শক্তি কাজ করেছে তা হল -

নতুন ধরণের পণ্যের আগমন ও সেই সংক্রান্ত সুবিধা এবং সেই সুবিধাকে ভোগ করার জন্য আমাদের রুচির বদল।

একটা অত্যন্ত জরুরী স্বীকারোক্তি করা দরকার - বৃহৎ পুঁজি তাদের পণ্য বাজারে ছেড়েই আমাদের রুচিকে, পছন্দকে, অগ্রাধিকারের বা গুরুত্বের ধরণকে পালটে দিতে পারছে। বৃহৎ পুঁজি ও তার দাসানুদাস আমাদের রাষ্ট্র, যৌথ উদ্যোগে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাদের অধীনস্থ করছে শুধু আমাদের অভ্যাস রুচি অগ্রাধিকার বা গুরুত্বের ধরণকে পালটে দিয়ে।

নতুন রাজনৈতিক চর্চা

আগের পর্বের আলোচনায় মনে হতে পারে আমরা যদি আমাদের সমাজের অগোছালোপনাকেই ভালো বলে মেনে নিই, তাহলে রাজনীতি করার দরকারটাই বা কি? যেমন চলছে তেমনই চলুক না। কিন্তু আমরা যে আগেই বলেছি, আম গাছকে ভালো আম গাছ হয়ে বেড়ে ওঠার পরিচর্যা করবো এবং জঙ্গলের গাছকে জঙ্গলেই বেড়ে উঠতে দেবো। আম গাছতো চেনা গেছে, সমাজের শক্তির জায়গাগুলোকে চেনার খোঁজ অন্তত শুরু করা গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ এক অবিরাম প্রচেষ্টা, সামাজিক-অর্থনৈতিক আধিপত্যকে রুখতে হলে আমাদের প্রতি নিয়ত খুঁজতে হবে বিকেন্দ্রীকরণের পথগুলোকে। খেয়াল রাখতে হবে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, সিদ্ধান্তের কেন্দ্রীকরণ, ধর্মের কেন্দ্রীকরণ, ভাষার কেন্দ্রীকরণ, সংস্কৃতির কেন্দ্রীকরণ সবই ক্ষমতাতুতো ভাই বেরাদর এবং আমাদের সমাজের পুষ্টিকে ঐ কেন্দ্রীকতা নিংড়ে নেবে, তাই যাবতীয় কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

এই কারণেই আমাদের ১ নম্বর ও প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য -

যে কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা। পাশাপাশি বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা ও সুযোগগুলোকে সতত খুঁজে চলা। এই বিকেন্দ্রীকরণ শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দিয়ে হবে না। উৎপাদন ব্যবস্থা যদি কেন্দ্রীয় হয় তাহলে ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় হবে। উৎপাদন কেন্দ্রীকৃত হলে গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচার বাড়বেই বাড়বে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাইলে উৎপাদনেরও বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তবেই গণতন্ত্র বিকশিত হবে।

আগের খাবার আর বাদ্যযন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনে, অভ্যাসে, উৎসবে, অনুষ্ঠান, পরবে আমরা অজস্র অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করি যেগুলো তথা কথিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনিশড প্রোডাক্ট নয়, ছোট কারখানায় ছোট পুঁজির উৎপাদন, এগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে। মনে রাখতে হবে বৃহৎ পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগুলোই আমাদের রসদ। আবার পাশাপাশি আমরা বহু সংখ্যক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনিশড প্রোডাক্ট ব্যবহার করি যেগুলো বানায় বৃহৎ পুঁজির বড় কারখানা, কিন্তু চেষ্টা করলেই সেগুলো অতি সাধারণ প্রযুক্তিতে ছোট উৎপাদনে বানিয়ে ফেলা সম্ভব, যেমন সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম, টুথপেস্ট, জামা, সোয়েটার ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস।

এখানেই প্রশ্ন আসবে সাবান শ্যাম্পু কি যে কেউ বানাতে পারবে? কোথায় পাবে প্রযুক্তি? হ্যাঁ এখানেই শুরু করতে হবে বিকেন্দ্রীকরণের সব থেকে প্রথম ধাপ - জ্ঞানের

বিকেন্দ্রীকরণ। স্পেশালাইজেশন আসলে বৃহৎ পুঁজির চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃহৎ পুঁজি যেমন কারখানার ভিতরে শ্রমিককে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই 'বিচ্ছিন্ন' যন্ত্রাংশ বানিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি সিলেবাস মারফৎ শেখায় - কেটে গেলে বহুজাতিক কোম্পানির অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন লাগাও, বিপরীতে আমাদের পরম্পরা বাহিত জ্ঞান - কেটে গেলে দূর্বা বা গাঁদা বা জার্মানি পাতা ডলে লাগাও সেই জ্ঞানকে বাতিল করে। অবাক কাণ্ড এটাই, যে এই অতি সাধারণ তথ্যগুলো আমাদের ছোট বেলার স্বাস্থ্য বইয়ের সিলেবাসেও থাকতো, কারা যে কাদের দালালি করে সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিলো সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে আমাদের ২ নম্বর রাজনৈতিক কর্তব্য -

জ্ঞান আহরণ ও তার বিকেন্দ্রীকরণ

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ

মানুষ তার সমাজ সভ্যতার শুরুর দিন থেকে কর্মের মাধ্যমে শ্রমের মাধ্যমে জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে প্রতি মুহূর্তে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে অভিজ্ঞতার সংশ্লেষে জ্ঞান অর্জন করেছে। এই বিশাল মহাকায় জ্ঞান ভাণ্ডারের অত্যন্ত এক সীমাবদ্ধ অংশ যা দিয়ে 'কনজিউমেবল ফিনিশড গুড' বানানো যায় ও বিক্রির ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় সেটুকুকেই 'দরকারি' লেবেল সেঁটে সিলেবাসে রেখেছে বাকি সব কিছুকেই 'নন প্রোডাক্টিভ' আখ্যা দিয়ে সিলেবাসের বাইরে রেখেছে। যাবতীয় পাঠক্রম সে ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকাল ইতিহাস দর্শন সঙ্গীত শিল্প যাই হোক না কেন, আমরা যাই শিখি না কেন তার 'রিসেল ভ্যালু' না থাকলে তা সিলেবাসে থাকে না, থাকলেও ঐ বিষয়গুলো নিয়ে বেশি লোকে আগ্রহ দেখায় না।

'রিসেল ভ্যালু' কিন্তু হিসেব কষে কর্পোরেট তার নিজস্ব পরিকাঠামোর নিরিখে। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানকে কর্পোরেট তার নিজস্ব পরিকাঠামোয় বেচে মুনাফা করতে পারে কি না। ৫০ বছর আগে 'বাউল' ভাবনাকে বেচার পরিবেশ ছিল না, তাই সিলেবাসেও ছিল না, আজ যন্ত্র সভ্যতা অনেক বেশি নির্মম হয়েছে, মানুষ হাঁফ ছাড়ার জায়গা চাইছে, তাই একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বাউল সিলেবাসে ঢুকেছে, সিনেমাও হচ্ছে। খেয়াল রাখতে হবে 'সিলেবাস' মানে কিন্তু শুধু স্কুল কলেজে যা পড়ানো হয় শুধুমাত্র সেটুকুই নয়, কর্পোরেট যা কিছুর পিছনে টাকা লগ্নি করে তার সবই এক অদৃশ্য সিলেবাস - নাটক, সিনেমা, গান, শিল্পচর্চা, খবরের কাগজ, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি সব কিছুই আসলে কর্পোরেট পরিচালিত পাঠক্রম, যা আমাদের প্রতি নিয়ত শেখাচ্ছে - কর্পোরেটের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাশিরাশি পণ্য ও তার বিপণন ব্যবস্থা সব শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য, এই পথই মানুষের ভাল থাকার একমাত্র পথ। 'মনের মানুষ' সিনেমা দেখে দর্শকরা দলে দলে নাগরিক পণ্য সর্বস্ব জীবন ছেড়ে দিয়ে বাউল হবে না - এটা কর্পোরেট ভালই জানে। বা উলটোটাও বলা যায়, ঐ সিনেমার মধ্যে যদি এরকম 'বিপজ্জনক' উপাদান থাকতো, তাহলে কর্পোরেট ঐ সিনেমার পিছনে টাকা ঢালতো না। সুতরাং আমরা যারা বড় ডিগ্রী অর্জন করেছি, তাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা বৃহৎ পুঁজি ও তার দাসানুদাস রাষ্ট্রব্যবস্থার চক্রান্তে আসলে মারাত্মক একচোখো এক সিলেবাসের কুয়োর ব্যাঙ হয়েছি।

তাই আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব

বৃহৎ পুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে যে উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে যা সযত্নে কর্পোরেট তার সিলেবাসের বাইরে রাখে, সেই উৎপাদন ব্যবস্থা ও সেই উৎপাদনকে নির্ভর করে যে সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা বহমান সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। বিপরীতে বৃহৎ পুঁজি তার উৎপাদন

ব্যবস্থার যে কলাকৌশল সিলেবাস মারফৎ আমাদের শিখিয়েছে তাকে বৃহৎ পুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে বণ্টন করে দেয়া। অর্থাৎ পরম্পরা বাহিত জ্ঞান ও পাঠক্রম বাহিত জ্ঞানের মধ্যে সংশ্লেষ ঘটানোর কাজটা আমাদের করতে হবে। যে ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা বৃহৎ পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, তাদের আন্দোলন আরও অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে তারা যদি এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হন। কারণ বৃহৎ পুঁজির মৌরুসিপাট্টা ভাঙার প্রথম পদক্ষেপ হল - জ্ঞানকে অর্গল মুক্ত করা।

জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ থেকে উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ

জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ গতি দেবে উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণকে, উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাবে পুঁজির বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুঁজির বিকেন্দ্রীকরণই পুঁজির আধিপত্যকে ক্রমাগত দুর্বল করবে। জানি খুবই সরলমতি তরলিকরণ মনে হচ্ছে। প্রায় মেড ইজির ভঙ্গিতে সমাধান বাৎলানো হচ্ছে। সত্যিই ব্যাপারটা এত সহজ নয়, কিন্তু এটা একটা বাস্তব সম্মত পথ হতে পারে। কঠিন কিন্তু সম্ভব।

বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক সিদ্ধান্তের তাড়াহুড়োয় বোঝা যাচ্ছে, ভারত সরকারের নাগালের বাইরে ভারতীয় সমাজে বহু লোভনীয় সম্পদের ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে বর্তমান এবং এই সম্পদকে কর্পোরেটের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই এই সরকারের উদ্দেশ্য। তাই আধারকার্ড, প্যানকার্ড, মোবাইল সংযুক্তি করণ তাই GST, তাই স্কুলের মিড ডে মিলেও আধারকার্ড সংযুক্তির প্রস্তাব। আমরা তো বুঝতে পারছি ভারতীয় সমাজের সব থেকে লোভনীয় সম্পদ - অসংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা। যার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণ লাগে না, ISI এর ছাপ্পার নিরাপত্তা লাগে না, ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত জ্ঞান লাগে না এবং এত কিছু সত্ত্বেও ৮৩শতাংশ মানুষের জীবিকার ঠিকানা দেয়। এই ক্ষেত্রকে বাগে আনার এই কেন্দ্রীকতার প্রক্রিয়াকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে। সে জন্যই সবার আগে ভরসা ও বিশ্বাস করতে হবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কারিগর অর্থনীতিকে।

আমাদের প্রাথমিক অবস্থান হোক কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো, যত ভাবে সম্ভব বড় পুঁজি বা কর্পোরেটের ওপরে নির্ভরশীল না হয়ে জীবন-যাপন। আমাদের জীবন-যাপনই হোক আমাদের রাজনীতির প্রতিফলন। আমরা বিপ্লবও করতে চাইছি না আবার বিপরীতে কর্পোরেটের চাকরী করে সরাসরি শোষণ ব্যবস্থার নাট-বল্টুও হবো না। তাহলে কি হবে আমাদের জীবিকা?

কৃষি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য

এই অবধি আলোচনায় আমরা কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক - কৃষি উৎপাদনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় আনছি না কেন? সত্যিই কৃষি উৎপাদনকে বাদ দিয়ে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কোনও আলোচনা হতেই পারে না। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষির সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদেরই সহপথিক - অনুপম পাল, দেবল দেব প্রমুখরা। তাদের আলোচনাগুলো বহুধা বিস্তৃত ও সুগভীর। আগ্রহীরা এদের লেখাগুলো পড়তে পারেন। কৃষি বিষয়ে আমরা এদের কাছ থেকে মূল যে বিষয়গুলো শিখেছি -

- ভারতের পরম্পরার কৃষিতে উৎপাদন যথেষ্ট। 'কৃষির উৎপাদন কম - তাই ভারত গরীব দেশ' এ তথ্য ভুল। অত্যন্ত সুকৌশলে এই মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে।
- ভারতীয় কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর নাম করে যে 'সবুজ বিপ্লব' করা হয়েছে -

তা প্রকৃতি বিরোধী, কৃষক ও ভোক্তার শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যর জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর।

● সবুজ বিপ্লবের নাম করে বৃহৎপুঁজির কর্পোরেটদের কৃষি ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

● কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত কৃষি চূড়ান্ত শোষণমূলক। কৃষক আপাদমস্তক কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত বীজ সার কীটনাশক সেচ ও যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে কৃষি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা নিদারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

● আমরা শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রীকতার যে সঙ্কটের কথা আগে আলোচনা করেছি, কৃষি উৎপাদনের সর্বাঙ্গে এই কেন্দ্রীকতার বিষাক্ত ঘা প্রকট ভাবে দেখা যাচ্ছে।

● বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী ৩ আইনকে কৃষকরা যে গৌরবময় আন্দোলন দিয়ে প্রতিহত করেছে তা ভারতের গণআন্দোলনের উজ্জ্বল অধ্যায়। আমরা এই আন্দোলনকে অভিবাদন জানাই। সাথে এও বলি - সঙ্কট আরো বহু মাত্রায়, বহু গভীরে। আশা রাখি - কৃষকরা কৃষির সঙ্কটগুলিকে আরও মূলগত উৎসস্থল থেকে সমাধানের রাস্তা দেখাবেন।

● ভারতীয় পরম্পরার চাষ - দেশী বীজ, জৈব সার, মরসুমি ফসলের সমাহার - ভারতীয় কৃষিকে সঙ্কট মুক্ত করতে পারে, কৃষিকে কর্পোরেটের থাবার তলা থেকে বার করে নিয়ে আসতে পারে। কৃষকের নিজস্ব বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কৃষি বৈচিত্র ফিরিয়ে আনতে পারে। রাসায়নিক কীট নাশকের দূষণ, যা পারমানবিক অস্ত্রের মতই বিপজ্জনক, সেই করালগ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে।

পরম্পরার চাষ সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর তাই তা করিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে হাত ধরাধরি করেই বিকশিত হয়। কৃষক ও কারিগর শুধু মিথোজীবি নয়, তারা পরস্পরের অঙ্গীভূত। বাস্তবতও বহু মানুষ একই সাথে কৃষক ও কারিগর এবং দুই ক্ষেত্রেই দক্ষ ও জ্ঞানী।

হকার ও ফেরিওয়ালা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য

কারিগরের আর এক সহচর হকার বা ফেরিওয়ালা। বস্তুত বহু হকার বা ফেরিওয়ালা আদতে কারিগর, উৎপাদক, আমরা বহু সময়েই তা খেয়ালও করি না। ফুচকাওয়ালা, ঘটি গরম, চাট বা চা বিক্রেতা কিন্তু একই সাথে উৎপাদন ও বিপনন দুটোই করেন। ফুচকাওয়ালা যদি শুকনো ফুচকাগুলো রেডিমেড কিনেও আনেন, তাহলেও তার সাথে অন্যান্য উপাদান তিনি যে দক্ষতায় মেশান তাতে শেষমেশ খাবারটা হয়ে যায় লোভনীয় এবং এরা প্রত্যেকে অকল্পনীয় দক্ষ বিক্রেতাও। একই জটলায় পাঁচ জন, দশজনকেও আলাদা চাহিদা অনুসারে একই সাথে তৃপ্ত করেন। এই বিপণন কৌশল, দক্ষতা যে কোনও কর্পোরেটের কাছেও ঈর্ষনীয়।

এছাড়াও অন্যান্য হকাররা প্রতিদিন যে কৌশলে পসরা সাজান, খরিদ্দারকে তৃপ্ত করেন আবার প্রতিদিন সেই পসরা গুছিয়ে তুলে রাখেন, ঝড় বৃষ্টি রোদ অন্যান্য বিপর্যয়কে সামলান তাদের এই ম্যানেজমেন্ট দক্ষতার কোনও তুলনা হয় না। কী বিপুল কর্মসংস্থান হয়, তার পরিসংখ্যান অর্থনীতির আলোচনায় নিতান্ত অচ্ছেদ্দায় উচ্চারিত হয় - আনঅর্গানাইজড সেক্টর হিসেবে। এই অচ্ছেদ্দার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমস্ত হকার ফেরিওয়ালাদের আমরা সমাজের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, সম্মানিত করতে চাই। দ্বিধাহীন কণ্ঠে সোচ্চারে বলতে চাই হকার বা ফেরিওয়ালারা কারিগরের অবিচ্ছেদ্দ বন্ধু এবং সমাজ এদের ছাড়া অচল। তাই সমস্ত জনসমাগমের স্থানে হকারদের ব্যবসা করার পরিসর দিতেই হবে, রেল বাস সর্বত্র এরা ভারতের সাধারণ মানুষকে যে অকল্পনীয় পরিসেবা দেন তা

কোনও প্রতিষ্ঠান প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না। হকারদের অধিকার সুরক্ষিত করতেই হবে।

হকারদের দক্ষতার একটা ছোট উদাহরণ - ফল বিক্রেতারা কমলালেবু বা মুসাম্বি একটার ওপরে একটা রেখে পিরামিড আকৃতিতে সাজিয়ে রাখেন। সবার উপরে রাখেন বেশি পাকা ফল, যেগুলো দ্রুত বিক্রি করে দেয়া দরকার, নিচে থাকে সেই ফলগুলো যেগুলো কম পাকা, পরের দিনেও বিক্রি করা যাবে। একটি গণিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন - ঐ পরিমাণ জায়গায়, আর কোন পদ্ধতিতে ফল সাজিয়ে এর থেকে বেশি ফল রাখা সম্ভব নয়। জানি না সে গবেষণায় কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, কিন্তু ফল সাজানোর এই পদ্ধতি রপ্ত করতে হকারদের কোন গবেষণা কেন্দ্রের সাহায্য লাগেনি এটাতে আমরা নিশ্চিত।

আমাদের পেশা ও আমাদের রাজনীতি

অনেকগুলো রাস্তা থাকবে জীবিকার, যা একই সাথে আমাদের পেটের খিদেও মেটাবে আবার একই সাথে কর্পোরেট বিরোধী লড়াইয়ের হাতিয়ারও হবে। আমরা প্রথমে এমন আঞ্চলিক সংগঠন বানাবো যে নিজে নিজের সম্পদ রোজগার করবে, নিজের ক্ষুদ্র কারখানায় পণ্য উৎপাদন এবং নিজস্ব দোকানে পণ্য বিপণনে অংশগ্রহণ করে, অথবা বিভিন্ন পরিসেবা বেচার বিনিময়ে, সেই সংগঠন প্রথম দিন থেকে কখনো কারো থেকে চাঁদা বা অনুদান নেবে না। চাঁদা বা অনুদানের ছিদ্র পথেই কালনাগিনী ঢোকে, কারণ ওগুলো আসলে অনুদান নয় সুদূর প্রসারী বিনিয়োগ যা দুর্নীতিকে ডেকে নিয়ে আসে।

সংগঠন নিজে রোজগার করবে কিন্তু লভ্যাংশ বণ্টন করবে না, কর্মীদের পারিশ্রমিক দেবে; লভ্যাংশ সামাজিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সম্পদ হিসেবে পুনর্বিনিয়োগ হবে। অর্থাৎ আমরা অঞ্চলে অঞ্চলে 'ব্যক্তি মালিক' বিহীন উৎপাদক সংগঠন চালাবো; কারণ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হবেই, কিন্তু সেই উদ্বৃত্তের চরিত্র অনেকটাই আলাদা। প্রথমত সেই উদ্বৃত্ত ছোট আকারের এবং দ্বিতীয়ত সেই উদ্বৃত্ত কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, সামাজিক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে সামাজিক সম্পদ তাই আধিপত্য চালানোর ক্ষমতা বিহীন। এই সামাজিক সম্পদের রসদেই আমাদের সংগঠন সমাজে কৃষক, কারিগর ও ছোট উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলে জোটবদ্ধ করবে, বৃহৎপুঁজির পরিপূরক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বিপণনের ফলে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত বিকেন্দ্রীকৃত হবে, তার ফলস্বরূপ ক্ষমতাও বিকেন্দ্রীকৃত হবে। এই সংগঠনের সাথে মানুষ যুক্ত হবেন পেশাগত ভিত্তিতে; এই কারণেই এই সংগঠনগুলি দল নয়, এখানে সদস্য দরকার নেই, দরকার কর্মী, তাই এই সংগঠনগুলি পেশাদার রাজনৈতিক সংগঠন। আমাদের গড়ে তুলতে হবে কৃষক, কারিগর ও ছোট উৎপাদন নির্ভর অঞ্চল ভিত্তিক ছোট জোট বা গিল্ড। বড় দলের দরকার নেই।

পেটের ইউনিয়ন

আপনি এই সংগঠনের পরিচালিত উৎপাদন বা পরিসেবা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন অথবা আপনার নিজের কোন উৎপাদন বা বিপণন বা পরিসেবা ক্ষেত্র থাকলে সেটিকেও এই সংগঠনের সাথে পেশাদার সম্পর্কে যুক্ত করতে পারবেন। মানে সোজা কথায় আপনি যদি নিজে ব্যবসা করেন তাহলে আপনার ব্যবসাটাকে আমাদের সংগঠনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই যুক্ত করতে পারবেন। হতে পারে আপনি আমাদের উৎপাদিত বা আমাদের সাথে সংযুক্ত অন্য কোন উৎপাদকের পণ্য আপনার দোকানে বেচবেন। আবার এও হতে পারে আপনার উৎপাদন আমরা আমাদের

দোকানে বা আমাদের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য দোকানে বেচার ব্যবস্থা করে দেব। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে - এই সংগঠন পেটের ইউনিয়ন, যার মূল কথাটাই হল বৃহৎপুঁজির বাইরের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সঙ্গবদ্ধ করা (সংঘবদ্ধ নয়) ও বিকশিত করা। প্রতিটি সংগঠন স্বাধীন তারা উৎপাদন বিপণন ও প্রকৌশল বিনিময়ের জন্য পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। তারা পরস্পরের সঙ্গী, তারা কোনও কেন্দ্রীয় সংঘের সদস্য নয়, কোনও নিয়ন্ত্রক কমিটির অধীন নয়।

আমাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত হবার একটাই শর্ত আপনি কর্পোরেটের বাইরের উৎপাদন ও বিপণনকে অগ্রাধিকার দেবেন। আপনি যদি বিক্রেতা হন আপনি চেষ্টা করবেন আপনার দোকানে যে মাজন কিনতে এসেছে তাকে বলা - আমাদের পাড়ার ছেলে নিজের ছোট কারখানায় যে মাজনটা বানিয়েছে সেটা একবার অন্তত ব্যবহার করে দেখুন, আমি নিজে ব্যবহার করে উপকার পেয়েছি। ওর ISI ছাপ্পা হয়তো নেই, কিন্তু ওর মাজন খারাপ হলে আপনাকে কনজিউমার ফোরামে মামলা করতে হবে না, ওকে সরাসরি ডেকে গাল দিতে পারবেন। ক্রেতা হিসেবে আমাদের সংগঠনের সমর্থক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে যে কোন জিনিস কেনার সময় অন্তত একবার খোঁজ করা লোকাল কোন কারখানায় তৈরি ঐ একই জিনিস আছে কিনা? আর আমাদের সংগঠনের সদস্য কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব হবে আগ্রহী উদ্যোক্তাকে কোলগেটের থেকে ভাল মাজন বানানোর গোপন বিদ্যাটা শিখিয়ে দেওয়া বা নিজেই মাজন তৈরির কারখানাটা বানানো।

উৎপাদনই রাজনীতি

সংগঠন প্রথম দিন থেকেই সরাসরি মানুষের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার সমাধানের কাজ করবে, আগে আমায় ভোট দাওগো বলে মড়া কান্না কাঁদবে না, প্রথম দিন থেকেই এই সামাজিক সংগঠন হবে মানুষের সামনে এক ইতিবাচক বিকল্প। মানুষকে সংগঠন স্বনির্ভর হবার পথে নেতৃত্ব দেবে। এই সংগঠন মানুষকে ঘুর পথে ধান্দাবাজি করার সুযোগ করে দেবে না, সংগঠনই নিজস্ব পণ্য উৎপাদন করবে, বিপণন করবে, বা বিভিন্ন পরিসেবা বেচবে। এই সংগঠন তার সদস্যদের সরাসরি বাণিজ্যের মাধ্যমে, পরিসেবার মাধ্যমে, শ্রম বা মেধার বিনিময়ে রোজগার করার পথ খুলে দিয়ে স্বনির্ভর করবে। মানুষকে রাষ্ট্র বা বড় পুঁজির ওপরে নির্ভর না করেও নিজের পায়ে আত্মসম্মানের সাথে জীবন নির্বাহের সুযোগ দেবে। আর এই পুরোটাই হবে আঞ্চলিক, নিজ অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে। কেউ স্বাধীন ব্যবসা করতে চাইলেও সংগঠন তাকে সাহায্য করবে - প্রযুক্তিগত সাহায্য, বিপণনের পরামর্শ, প্রচার, কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

বলতে পারেন এতো ব্যবসায়িক সংগঠন হচ্ছে এখানে রাজনীতি কোথায়? উলটো দিকে তাকিয়ে দেখুন যারা রাজনীতিকে অস্ত্র করে আমাদের জীবন জীবিকা রুচি পছন্দ সব কিছু কে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা হাজার ফিকিরে গণ্ডা গণ্ডা চেম্বার্স অফ কমার্স বানিয়ে নিজেরা কেমন জুড়ে জাপ্টিয়ে থাকছে। ওদের আধিপত্য যদি খর্ব করতে হয় তাহলে আমাদেরও জোট বাঁধতে হবে, ওরা যদি ওদের পণ্য দিয়ে আমাদের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে ওদের পণ্যের বিকল্প আমাদের উৎপাদন করতে হবে যাতে আমরা যত দূর সম্ভব বৃহৎপুঁজির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকতে পারি এবং আমাদের জোট আমাদের বিকশিত হতে সাহায্য করবে।

চারপাশের সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আজ মানুষ যে জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বহু রকমের পণ্য প্রতি নিয়ত তারা ব্যবহার করে,

বস্তুত এই পণ্যগুলি যতটা মানুষ ব্যবহার করে ঠিক ততটাই বৃহৎপুঁজি এই পণ্যগুলি মারফৎ মানুষকে ব্যবহার করে। মানুষের চেতনা, তার পছন্দ, তার চাহিদা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এই পণ্যগুলি মারফৎ, এবং এর ফলে সমাজে যে নিয়ন্ত্রণ বৃহৎপুঁজি কায়েম করে তাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র শক্তিকেও প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। পণ্য ব্যবহার করতে করতে মানুষ পণ্যকে জীবনের অবিচ্ছেদ অঙ্গ করে নেয়। আমরা চেষ্টা করবো বৃহৎপুঁজির পণ্যকে আমাদের কারিগরি পণ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে। এর ফলে আমরা বৃহৎ পুঁজির আধিপত্যকেও প্রতিস্থাপিত করতে পারবো। কর্পোরেটের বিশাল সিস্টেমের সাথে স্থানীয় উৎপাদন দিয়ে লড়াই করা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতে পারে, এ লড়াই তখনই সম্ভব যখন আমরা উৎপাদককে সর্বচ্চো সম্মান দেয়ার বিকল্প সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে পারবো। প্রতিটি অঞ্চলের সংগঠনের দায়িত্ব হবে সেই অঞ্চলের উৎপাদনের সামাজিক সংস্পর্শ তৈরি করা। পাড়ার চায়ের দোকানদার, মিষ্টির দোকানদারদের মঞ্চে তুলে সম্বর্ধনা দিতে হবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে - তাদের বানানো খাবার আমরা বিশ্বাস করে আমাদের সন্তানের মুখে তুলে দিই, এ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা যেমন তাদের দায়িত্ব, তেমনই তারাও এক বা একাধিক কর্মীর পরিবারের অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই তারাই সমাজের নায়ক। আঞ্চলিক উৎপাদকদের সামাজিক সম্মানের জন্য গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

মনে হতে পারে এই পদ্ধতিতে বৃহৎপুঁজির বদলে আমরা আমাদের সংগঠন মারফৎ আমাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছি সমাজের ওপরে, কিন্তু না তা হবে না, বলা ভালো আমাদের সংগঠনের সেই ক্ষমতাই তৈরি হবে না, কিন্তু সমাজের বিকাশে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবো। কি পদ্ধতিতে সেটা হবে তা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে সব উৎপাদন কি আমরা ছোট কারখানায় বানাতে পারবো? না সব কিছু পারবো না, কিন্তু যতটা পারি ততটা কেন করবো না, মাঠে না নেমে ওয়াকওভার দেবো কেন? আবার একটা কথা আমাদের খেয়াল করতে হবে প্রযুক্তির বিকাশ বহু ক্ষেত্রেই বিপরীত আন্দোলনকেও বহু সুযোগ করে দেয়, যেমন গুগল ফেসবুক তো বৃহৎপুঁজিরই খেলোয়াড়, এবং মানুষকে বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভার্চুয়াল জগতে মজিয়ে রাখার একটা প্রক্রিয়া কিন্তু তাকে কাজে লাগিয়েই কি আজ আমরা সংগঠিত হচ্ছি না? প্রযুক্তিকে কি ভাবে ব্যবহার করবো তাতেই বোঝা যাবে আমরা কোন পক্ষের হয়ে কাদের জন্য কাজ করছি।

প্রযুক্তি নিয়ে কয়েক কথা

আদতে কোন প্রযুক্তিকে 'উন্নত' বলবো সে সম্পর্কে কর্পোরেট আমাদের যা শেখায় তার মধ্যে প্রচুর একপেশে দৃষ্টি ভঙ্গী আছে। আমরা কোন প্রযুক্তিকে 'উন্নত' বলবো - যে প্রযুক্তি একটা জটিল/সহজ কাজ খুব জটিল ভাবে সম্পাদন করে না কি জটিল/সহজ কাজকে সহজে করে। যেমন তাঁত আর কাপড়ের মিল - আগেরটি খুব সহজ প্রযুক্তিতে জটিলতম কাপড় করত, আর পরেরটি জটিলতম পদ্ধতিতে খুব সহজ কাপড় উৎপাদন করে। তাহলে কোনটাকে আমরা এগিয়ে থাকা প্রযুক্তি বলবো? মাপকাঠি কি হবে - প্রযুক্তির জটিলতা, নাকি সরলীকরণ। এর সঙ্গে বলা দরকার সেই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ কে করে। আর যে অর্থ বিনিয়োগ করে যে প্রযুক্তি বিকাশ ঘটানো হচ্ছে তার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কি কাজ সে করাতে চাইছে? এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে আমরা প্রযুক্তিকে কিভাবে দেখছি তার দৃষ্টিভঙ্গি।

কর্পোরেট পোষিত প্রযুক্তিও একটা বিশেষ চর্চাকে গত কয়েক দশকে বাড়িয়ে

তুলতে চাইছে। সেটা হল বৃহৎ কারখানার প্রোডাকশন লাইন যে ভাবে একই পণ্য লক্ষ লক্ষ কপি একই রকম ভাবে করে চলে তার পাশাপাশি এমন বহু প্রযুক্তিকে চর্চা করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সহজেই ১টা প্রোটোটাইপ তৈরি করা যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা যাবে। কারখানার প্রোডাকশন লাইনে প্লাস্টিকের ফুলদানি একই ছাঁচে ফেলে অসংখ্য কপি তৈরি করা যায়, কিন্তু যদি বলা হয় প্রত্যেকটা ফুলদানির আকার ভিন্ন ভিন্ন তৈরি করতে হবে হবে, তাহলে কারখানার প্রযুক্তিতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক এই চাহিদাতেই কর্পোরেট তৈরি করে ফেলেছে নতুন প্রযুক্তি - 3D প্রিন্টিং, এই প্রযুক্তিতে ছাঁচ ছাড়াই প্লাস্টিকের জিনিস বানানো সম্ভব, ফলে চাইলে ১ পিস বা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অনেক পিস বানানো সম্ভব। আজ মোবাইল ফোন ছোট কারখানায় বানানো সম্ভব নয়, কিন্তু CNC, 3D প্রিন্টিং এবং আরও বহু প্রযুক্তি যে পথে এগোচ্ছে তাতে কয়েক বছর বাদে হয়তো বহু অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাবে।

এর সাথে যুক্ত করতে হবে বিশ্বব্যাপী 'কপি লেফট' বা DIY আন্দোলনকে। কপি লেফট আমাদের দিয়েছে লিনাক্স, উবন্তু, অভ্র কি বোর্ড, ব্লেন্ডার 3D-র মত আরও বহু সফটওয়ার, যার কোন মালিকানা নেই, গোটা পৃথিবীর স্বেচ্ছা সেবকরা এই সফটওয়ারগুলো বানাচ্ছে, উন্নত করছে। আবার এর পাশাপাশি Do it yourself (DIY) আজ আর নিছক শখ বা হুজুগ নয়, ইউটিউব খুললেই দেখা যাবে অজস্র ভিডিওতে সারা পৃথিবীর অজস্র মানুষ তাদের আয়ত্তের প্রযুক্তি পৃথিবীর সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। আমাদের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে জ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বদেশ বিদেশ বলে কিছু হয় না, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানানসই, মানুষের আত্মবিকাশের উপযোগী জ্ঞান বা প্রযুক্তিকে গ্রহণ ও প্রয়োজন মত পরিমার্জন করতে হবে।

সংসদীয় রাজনীতি

আমাদের সংগঠন বাকিদের থেকে 'মন্দের ভাল' নয়, মানুষের সামনে ইতিবাচক বিকল্প হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে। সংসদীয় গণতন্ত্র তার অজস্র গলদকে নিয়েও মানুষের কাছে সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য পথ। পাশাপাশি এটাও ঠিক মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বা ভরসা হয়ে ওঠার জন্য সরকার গঠন করাটাই একমাত্র সোপান নয়, সরকারে না থেকেও মানুষের বহু সমস্যার সমাধান করা যায়। বস্তুত সরকারের মুখের দিকে চেয়ে থাকা, সব বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আকাঙ্ক্ষা করা, সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এক জন নেতা আর তার পাশে এঁটুলির মত লেগে থাকা চামচার দল, মানুষের সামনে কৌটো নাড়া, ব্যবসায়ীদের কাছে ডোনেশন, চামচাবাজীর বিনিময়ে দালালী সিন্ডিকেট তোলাবাজী সাট্টা চোলাইয়ের ঠেক, নিরীহদের জন্য রাস্তার পাশে গুমটি দোকান এই চির চেনা ছবিটা বদলাতে চাই। তাই দল চাই না, চাই রাজনৈতিক সংগঠন।

আমাদের সংগঠনগুলো রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্যোগী মানুষকে স্থানীয় ছোট উৎপাদন ও বিপণন কেন্দ্র তৈরিতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি স্থানীয় বর্তমান উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে আঞ্চলিক গিল্ড বা জোট সংগঠন তৈরি করবে। এই সংগঠনগুলো হবে অঞ্চল ভিত্তিক, আঞ্চলিক প্রয়োজন ভিত্তিক, বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বাধীন। রাজ্য ব্যাপী যে সংযোজক বা সঞ্চালক পরিষদ থাকবে তারা কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ করে সবার ওপরে চাপিয়ে দেবে না, তারা শুধু বিভিন্ন অঞ্চলের সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে সবার খবর সবার কাছে পৌঁছে দেবে, প্রয়োজনে তারা এক অঞ্চলের উৎপাদন বা পরিসেবাকে অন্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ করাবে, আঞ্চলিক সংগঠন নির্ধারণ করবে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে কিনা। আঞ্চলিক সংগঠনের চাহিদার ভিত্তিতে রাজ্য

সঞ্চালক পরিষদ রাজ্যস্তরের যৌথ কর্মসূচী রূপায়ণ করবে। এই ভাবে আমাদের সংগঠন নিজে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার রাস্তা গোড়াতেই নির্মূল করবে।

এই সংগঠন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে দুই ভাবে।

প্রথমত; আঞ্চলিক সংগঠন তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পেশাদার সমাজ কর্মী নিয়োগ করবে, এই কর্মী নেতা নয়, সংগঠনের কর্মচারী, যদি সেই কর্মচারীর কোন সহায়ক দরকার হয় তাহলে আঞ্চলিক সংগঠনই তাদের নিয়োগ করবে, সমাজ কর্মী তার চেলার দল তৈরি করে নেতা হবে না। এই সমাজ কর্মীদের প্রাথমিক কাজ হবে উৎপাদন বা পরিসেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা ও ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমাধানের চেষ্টা করা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা আদায় করা, যা স্থানীয় উৎপাদনকে বিকশিত করতে পারে। পাশাপাশি সংগঠন সামাজিক যৌথ সহায়তার রেওয়াজকে উন্নত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাবে।

দ্বিতীয়ত; এই সমাজ কর্মীরাই পরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, আঞ্চলিক সংগঠনের সমর্থনে। অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিরা হবে সামাজিক সংগঠনের মাইনে করা কর্মচারী। যাদের রোজগারের পাই পয়সা হিসেব সমাজ জানবে। যদি কোন জন প্রতিনিধি দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে তার রোজগারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে শুরু করে, তাহলে সংগঠন তাকে বরখাস্ত করবে, তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আইনগত অভিযোগ দাখিল করবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে তাকে বয়কট করবে।

দ্বিমুখী লড়াই

আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই আমাদের সংগঠন একই সাথে দুটি ময়দানে লড়াই করবে, দুটো লড়াইই একে অন্যের পরিপূরক। এক দিকে কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থাতে সম্পৃক্ত হয়ে কর্পোরেটের বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকশিত করবে, অন্য দিকে রাজনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে গন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কর্পোরেটের দাদন খেকো রাজনৈতিক দলগুলোকে বিরোধিতা করবে। মনে হতে পারে, একটা গণআন্দোলনকে চালিয়ে যাওয়াই মুশকিল আজকের দিনে, আমরা আবার এক সাথে দুটো ময়দানে লড়াই করার কথা কিভাবে ভাবছি? ভাবছি তার কারণ হল এটাই বাস্তব সম্মত উপায়, যার মাধ্যমে লড়াইয়ে রসদ কম পড়বে না, কারণ লড়াইয়ের রসদের জন্য আমাদের কারো কাছে হাত পাততে হবে না, আবার যারা লড়তে চায় তাদের রোজগারের সম্মান জনক উপায় যখন সংগঠন করে দিচ্ছে তখন লড়াইয়ের ময়দানেও মানুষ কম পড়বে না। মানুষকে আমরা বলতে পারবো -

আমাদের সাথে যুক্ত হলে আপনার রোজগারের নিশ্চয়তা বাড়বে। যত বেশি সংখ্যক মানুষকে আমরা যুক্ত করতে পারবো, তত বেশি ধরণের উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ বাড়বে, তত বেশি নিশ্চয়তা মানুষ উপভোগ করবে। আধুনিক প্রযুক্তির উৎপাদন যেমন থাকবে পাশাপাশি থাকবে পরম্পরাগত উৎপাদন বা পেশার মানুষ যেমন কামার কুমোর ছুতোর তাঁতি নাপিত স্যাঁকরা ডোকরা ইত্যাদি পেশায় যুক্ত মানুষ, আবার দোকানদার ফেরিওয়ালা মুটে মজুর মিস্তিরি আরও হাজার রকমের মানুষ। এরা সবাই যদি আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে পরস্পর একে অপরের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সবার সাথে সবার যোগাযোগে সবার কাজের সুযোগ বাড়বে। আবার একই সাথে এক জনের জীবিকা বিপন্ন হলে সবাই তার জন্য লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জীবন জীবিকার লড়াই বা সামাজিক রাজনৈতিক অধিকারে লড়াই দুটো আলাদা লড়াই থাকবে না, কোন লড়াইয়েই মানুষ একলা হয়ে পড়বে না বরং এই দুই লড়াইই হয়ে উঠবে আমাদের সমাজে সব মানুষের মাথা উঁচু

করে বেঁচে থাকার লড়াই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের নেতারাই সমাজের নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করে, ফলে সমাজ রাষ্ট্র নির্ভর হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক নেতারা সামাজিক বিষয় এমন কি পারিবারিক বিষয়েও নাক গলায়। আমাদের সংগঠনে এই ধরণের নেতা তৈরি হবার সম্ভাবনা গোড়াতেই নির্মূল করা হবে। আমাদের সংগঠনের কর্মীরা নেতৃত্ব দেবে না, বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিসেবা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই তাদের দায়িত্ব, নেতা তৈরি হবে কৃষক, কারিগর, ছোট উৎপাদক, শ্রমিক সমাজের মধ্য থেকে, তারা হবেন উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতা, আঞ্চলিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার নেতা, সামাজিক সঙ্কটে দিশা দেখানোর নেতা। সামাজিক সংগঠনগুলি বিকাশের রাস্তা খুঁজবে, পরিকল্পনা করবে, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করবে সরকারের পরিচালনায় রাষ্ট্র। সমাজ হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। যার মূল চালিকা শক্তি হবে কৃষি, কারিগর ও উৎপাদক সমাজ। রাষ্ট্র ক্ষমতা নেতৃত্ব দেবে না, শুধু পরিসেবা দেবে সমাজ কে।

আঞ্চলিক উৎপাদনের আর এক ইতিবাচক দিক হল পরিবহণ নির্ভরতা কম। অর্থাৎ স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল উৎপাদন তাই দূরদূরান্তে পণ্য পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা কম। পরিবহণ নির্ভরশীলতা আজকের দুনিয়ায় বড় সঙ্কট। এর প্রত্যেকটি ধাপই পরিবেশকে অকল্পনীয় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাস্তা আর রেলের পাথর যোগান দিতে যে কত পাহাড় গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে, তার গোনাগুন্তি নেই। বাস্তুতন্ত্রর উপর এ এক ভয়ঙ্কর অত্যাচার। স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা যদি আমাদের পরিবহন নির্ভরতাকে কিছুটাও সীমায়িত করতে পারে, তা সুস্থ ধরিত্রীর জন্য অসামান্য পদক্ষেপ হবে।

সামাজিক সম্মানের লড়াই

এর ফলে অনেকগুলো ঘটনা একসাথে ঘটবে - আমাদের সাংগঠনিক কর্মসূচী ও নীতিগত অবস্থানে উৎপাদনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ধার্য করা হচ্ছে, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষরা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, বৃহৎপুঁজি যেমন তার তৈরি উৎপাদন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক-সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, বিপরীতে কারিগরি উৎপাদন তার অঞ্চল ভিত্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্ব পাবে। সব পেশার সব মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে, কি ভাবে প্রায় সব ধরণের পেশার বেশির ভাগ মানুষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত হবেন সেই আলোচনা পরের অধ্যায়ে লেখা হবে। সব পেশার মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হবার কারণে সবাই সবাইকে সম্মান করবে। অর্থাৎ পেশাগত পরিচয়ে সামাজিক উঁচু নীচুর ধারণা ও প্রথাকে বিদায় জানাতে হবে। আমাদের সংগঠনে মানুষের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হবে - তিনি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদের কাছে সব থেকে সম্মানিত ব্যক্তি হবেন - উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় মানুষেরা।

শ্রমিকের সামাজিক উত্তরণ

এখানে প্রশ্ন থাকে এই ব্যবস্থা কি শোষণ মুক্ত সমাজ গড়তে পারবে? না পারবে না। আমরা জানি শ্রমিকের শ্রম চুরি করেই মালিকের মুনাফা হয়, এবং এই ব্যবস্থায় আমরা সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদের কথা বলছি না। তাহলে কি দাঁড়াবে শ্রেণী

সম্পর্ক আর শ্রেণী সংঘাতের পরিণতি?

ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছি না, কারণ মার্ক্সীয় অর্থ-রাষ্ট্রনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার বিকল্পে যে রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথা বলা হয় তাতে রাষ্ট্র এক সর্বগ্রাসী কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে ওঠে। সমাজ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমরা ব্যক্তি মালিকানা বিহীন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দিতে চাইছি। এই সামাজিক সংগঠনের লভ্যাংশ বন্টিত হবে না, কর্মীরা পারিশ্রমিক পাবে, এবং উৎপাদনের উদ্বৃত্ত সামাজিক সংগঠন মারফৎ বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক সম্পদ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানার উৎপাদনও বজায় থাকবে। কোন একটি উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী আধিপত্য থাকবে না। এই ব্যবস্থায় আমরা মানুষের সামনে বহু রকমের সুযোগ দিতে পারবো। যে কেউ পছন্দমত ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারবে। মানুষের স্বাধীনতা থাকবে সে সামাজিক সংগঠনে যোগ দিয়ে নিজের জীবিকা চালানোর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের সরাসরি অংশীদার হবে, নাকি অন্য বিকল্প বেছে নেবে। সেক্ষেত্রে, সামাজিক সংগঠনের মধ্যে একজন শ্রমিক যখন কাজ করবেন তখন তার শ্রেণী অবস্থান একজন সাধারণ শ্রমিকের শ্রেণী অবস্থান এর থেকে ভিন্ন হবে। শ্রেণীহীন সমাজ হয়তো গঠন করা যাবেনা, কিন্তু শ্রমিকের সামাজিক উত্তরণের পথ খুলে যাবে।

শ্রেণী সম্পর্ক আর শ্রেণী সংঘাতের ছবি কিন্তু সব জায়গায় সব প্রেক্ষিতে এক নয়, অন্তত আমাদের সমাজে তো নয়ই। যে মালিক ৭০০ শ্রমিককে খাটিয়ে মার্সিডিজ চড়ে তার সাথে তার শ্রমিকের শ্রেণী সংঘাত একরকম, আবার যে মালিক ১০-১২ জন শ্রমিককে খাটিয়ে স্কুটার চড়ে, টিফিনে এক সাথে বসে মুড়ি চানাচুর খায় তার সাথে তার শ্রমিকের শ্রেণী সংঘাত অন্যরকম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী সংঘাত নেই তা বলছি না, কিন্তু ছবিটা আলাদা। জানি অনেকেই একমত হবেন না, কিন্তু মালিক মানেই শ্রমিকের শ্রেণী শত্রু এই তত্ত্বটা আমাদের উন্নত কোন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাচ্ছে কি? ভারতের কমিউনিজম চর্চার প্রায় শতাধিক বছরের ইতিহাস কোন ইতিবাচক উত্তর কিন্তু আমাদের সামনে রাখতে পারেনি। বরং বলা যেতে পারে -

পিরামিড যত বড়, শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির দূরত্ব তত বেশি। আমরা তাই ছোট পিরামিডের পক্ষে। আমাদের মূল লক্ষ্য ব্যক্তি মালিকানা বিহীন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া। মানুষের ঐক্যের প্রতি, সমাজের সর্বজনীন ক্ষমতার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, আস্থা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের এই ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন সংস্থাগুলি ক্রমাগত শক্তিশালী হবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পাবে। পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদন সংস্থাগুলি সামাজিক উৎপাদন সংস্থাগুলির সহায়তা ও সহযোগিতা পাবে। এইভাবে সামাজিক উৎপাদন সংস্থার নেতৃত্বে কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি ক্রমাগত জোটবদ্ধ হবে। তাই আমরা সামাজিক উৎপাদন সংস্থার নেতৃত্বে বিকেন্দ্রীকৃত ছোট কারখানার পক্ষে, ছোট উৎপাদনের পক্ষে, বিকেন্দ্রীকৃত পুঁজির পক্ষে, কারিগরি জোটের পক্ষে। অর্থাৎ শ্রেণী বৈষম্য আমূল উচ্ছেদ করার কোন উপায় যখন সত্যিই খুঁজে পাইনি বিশ্ব ভুবনের কোথাও, তখন শ্রেণী বৈষম্য কমিয়ে আনার পথটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাই দ্বিধা মুক্ত ভাবে। বলা ভালো, পুঁজিকে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করে নিয়ে, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী, সমাজের বেশির ভাগ মানুষের বিকাশের উপযোগী করে নিতে চাইছি। আমরা চাইছি সমাজ হোক বিকেন্দ্রীকৃত ও যথা সম্ভব বেশি আত্মনির্ভরশীল এবং রাষ্ট্রের উপর যথা সম্ভব কম নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের পরিচালকদের ওপর সমাজ যদি কম নির্ভর করে, তাহলেই রাজনৈতিক দল ও নেতাদের আধিপত্য কম হবে,

নাগরিকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নেবার পরিসর প্রসারিত হবে।

আরও এক ভাবে ভাবা যেতে পারে কর্মী মালিক সম্পর্ককে। আমরা আগেই বলেছি বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ দিয়ে। অর্থাৎ কোন উৎপাদনের প্রকৌশল কারো কুক্ষিগত থাকবে না। আমরা যে উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়াচ্ছি, সেখানে কর্মী যন্ত্রাংশ-সম রোবট নয়, সে গোটা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কোনও তথ্য, কোন বিদ্যা তার নাগালের বাইরে নয়, কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়া এবং বিপণন পর্যন্ত, যে কোন বিষয়ে জানা ও অংশগ্রহণ করার অবাধ অধিকার প্রতিটি কর্মীর থাকবে, সে কতটা শিখতে পারবে, মগজে ও শরীরে ধারণ করতে পারবে তার ওপর নির্ভর করবে, সে নিজের কতটা উত্তরণ ঘটাতে পারবে। অর্থাৎ এক জন দক্ষ কর্মী চিরকাল কর্মী থেকে যাতে বাধ্য হবে না। যে ভালো করে জানে উৎপাদনের খুঁটিনাটি বিষয়, যার স্বাধীন ভাবে উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে, তাকেই আমাদের সংগঠন সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে। আমাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে ছোট ছোট সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সংহত করা, দক্ষ কারিগর এই উৎপাদন সংস্থার নেতৃত্ব দেবে, অর্থাৎ যে শিক্ষনবীশ কারিগর হিসেবে জীবিকা শুরু করছে, সে যদি দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে সে উৎপাদন ব্যবস্থার নেতৃত্ব হয়ে উঠতে পারবে। আবার তার পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে যে উদ্বৃত্ত তৈরি হবে, তাকে ব্যক্তি মালিকানার বদলে সামাজিক সংস্থার হেফাজতে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারবো। দক্ষ কারিগর ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী মানুষেরা এই সামাজিক সম্পদের সামাজিক ব্যবহারের দিগদর্শনের দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু এই সম্পদের আকার যেহেতু ছোট হবে সেহেতু তার আধিপত্য করার ক্ষমতা থাকবে না। উলটে কারিগর ও কর্মীর সামাজিক উত্তরণের পথে আমাদের আন্দোলন অনুঘটকের ভূমিকা নেবে। যে ভাবে কারিগর সমাজে হয়, ওস্তাদের অধীনে কাজ করতে করতে অনেক চেলাই নিজে ওস্তাদ হয়ে নিজের কারখানা বানায়। রাজমিস্ত্রির যোগাড়ের কাজ করতে করতে যোগাড়ে এক দিন রাজমিস্ত্রি হয়, সেই ধারাবাহিকতাতেই আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক উদ্বর্তনের রাস্তা প্রশস্ত হবে।

এই কারণেই কারিগরি উৎপাদনের শ্রম শোষণকে আমরা গোড়ায় উপেক্ষা করে ছিলাম। কারণ কারিগরি উৎপাদনে হেড মিস্তিরি তার অধীনস্ত কারিগরের শ্রম শোষণ করে, কিন্তু তার বিনিময়ে তাকে শুধুমাত্র মজুরি দেয় না, সাথে দেয় সহস্রাব্দ বাহিত, প্রজন্মান্তরে পরিশিলিত প্রকৌশলের অপার সম্ভার। হাজার হাজার বছর ধরে যে প্রকৌশল গড়ে উঠেছে তার বাজার মূল্য কত? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ বিদ্যাকে কত মূল্যে বেচে? তাদের বিদ্যার দাম আছে, কারিগরের কৃষকের বিদ্যার দাম নেই? সেই দাম কি শ্রমশোষণকে পরিপূরণ করে না? মনে রাখবেন কারিগরের বিদ্যা অনুজ কারিগরকে চিরকালের মত স্বাধীন উৎপাদনের রাস্তা খুলে দেয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত কর্পোরেট শোষণযন্ত্রের নাট-বল্টু হতে বাধ্য করে না।

একটা অভিযোগ প্রায়ই কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি ওঠে - মজুরি কম। হ্যাঁ মজুরি কম এটা সত্যি। কিন্তু কার তুলনায় মজুরি কম? সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীর তুলনায় মজুরি কম। কিন্তু কেন এরকম হয়? বৃহৎপুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থা আদতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের অবাধ লুঠের বন্দোবস্ত। তাদের কর্মীরা পায় বড় লুঠের বড় হিস্যা, সরকারের বদান্যতা না পেলে যাবতীয় বৃহৎশিল্প রাতারাতি শুকিয়ে যাবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের মাইনের বড় অংশ ভর্তুকী। কারণ বেসরকারি ক্ষেত্রে কোথাও কর্মী কোনও দায়িত্ব

সম্পূর্ণ পালন না করতে পারলে মজুরি পায় না, তার কাজই চলে যায়, সরকারি ক্ষেত্রে কাজের এই বাধ্যবাধকতা নেই। বৃহৎপুঁজির লুঠের বন্দোবস্তকে সুরক্ষিত রাখাই সরকারের কাজ। তাই সরকারি কর্মচারীও লুঠের ব্যবস্থারই পরোক্ষ অংশীদার। কারিগর সমাজ এই লুঠের ব্যবস্থার বাইরে, তারা এই লুঠের ভাগ নেয় না, তাই তাদের রোজগার কম, মজুরি কম। আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার - মজুরি বাড়ানোর দাবীতে আর একটা দাবী অনুচ্চারিত থেকে যায়, বাকিদের রোজগার যেন না বাড়ে। অর্থাৎ সমাজে সবার রোজগার যদি সমান হারে বাড়ে, তাহলে সেই বাড়তি রোজগার কারোরই কাজে লাগবে না, কারণ জিনিসের দামও সেই হারে বা তার থেকেও বেশি হারেই বাড়বে। ব্যাপারটা দাঁড়াবে এরকম - যদি প্রতিটি কারেন্সির মূল্যকে একই হারে বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে যা হবে। অর্থাৎ ১ টাকার দাম হল ২ টাকা, ১০ টাকার দাম হল ২০ টাকা, ১০০ টাকার দাম হল ২০০টাকা। তাহলে আজ যে দশ হাজার রোজগার করছে সে তো বিশ হাজার রোজগার করবেই, কিন্তু যে জিনিসটা সে ১০০টাকায় কিনছে, সেটার দামও ২০০টাকাই হয়ে যাবে। শেষমেস হরেদরে হাঁটুজল। অর্থাৎ যাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি উঠছে, শুধু যদি তাদেরই মজুরি বাড়ে, অন্য কারো রোজগার না বাড়ে, তবেই সে পাবে মজুরি বৃদ্ধির সুবিধা, কিন্তু সেটাতো সম্ভব নয়। তাই মজুরি বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান নয়, সামাজিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই রোজগার বাড়াতে পারে, কারণ তা সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করে। এ শুধু কথার কথা নয় - এর বহু উদাহরন আছে। সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি সামাজিক সম্পদকে কে কী বিপুল আকার দিতে পারে তার উদাহরণ - পলাশি পূর্ব বাংলার সমাজ। এ নিয়ে বহু তথ্যায়ণ হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সামাজিক বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ১০০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছিল। বাংলা লুঠ করতে বিদেশী বণিকরা এমনি এমনি আসেনি, সত্যিই সে বাংলা ছিল সোনার বাংলা।

এর সাথে যোগ করতে হবে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপনিবেশিক সময়ে বা তার পরেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থে, ইউরোপ তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে মানুষের মানবিক গুণাবলীকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। অর্থাৎ আজকের বৃহৎ যন্ত্র নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মানুষের গুণ বা দক্ষতা বৃদ্ধির সম্পর্ক সমানুপাতিক নাও হতে পারে, বরং মালিকের কাছে অনেক বেশি কাম্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তৈরি অটোমেটিক মেশিনের সাথে শ্রমিক নিজেকে মানিয়ে নিক। আরও পরিষ্কার ভাবে বললে যন্ত্রের সাথে যন্ত্র উঠতে পারলেই মানুষ আদর্শ শ্রমিক হয়ে উঠবে বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থায়। অর্থাৎ মানুষের সৃজন ক্ষমতার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে একটা সিস্টেমের যন্ত্রাংশ হয়ে ওঠাটাই। এটা দক্ষতার চর্চা নয়, অদক্ষতার চর্চা, মানবিক-গুণাবলীর অধঃপতন। আমরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমরা এমন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যা মানুষের দক্ষতা নির্ভর, সৃজন ক্ষমতা নির্ভর। মানুষ আরও বেশি সুযোগ্য মানুষ হয়ে উঠুক, সামাজিক বিকাশে, বহুজনের বিকাশে নির্ণায়ক ভূমিকা নিক মানুষ এটাই আমাদের কাছে কাম্য। কোন এক পুঁজিপতির বৃহৎ কারখানায় যন্ত্রাংশ সম রোবট হয়ে ওঠার থেকে, পরিবেশ সহায়ক সামাজিক উৎপাদনে শ্রমজীবী মানুষ, আরও বেশি সামাজিক মানুষ হয়ে উঠুক এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা চাই মানুষের মানবিক গুণের বিকাশ হোক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকে। পাশাপাশি এটাও স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সবার ক্ষমতা সমান হয় না, তেমন কোন সাম্য আমাদের দুনিয়ায় সম্ভব নয়।

সাম্যে বিশ্বাস করি না, সমান অধিকারে বিশ্বাস করি। প্রকৃতি আমাদের শিখিয়েছে, সাম্য বলে কিছু হয় না, একই আম গাছের সব পাতা একই রকম কিন্তু সব পাতা সমান বা প্রতিরূপ নয়। সমুদ্রের তটেও দুটো হুবহু এক বালির দানা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গাছের

সব পাতা যেমন রোদ পায়, প্রয়োজনে গাছ তার ডালপালা বাঁকিয়ে সেই সুযোগ তৈরি করে; বিকেন্দ্রীকৃত কারিগরি উৎপাদনের জোট ভিত্তিক ব্যবস্থাও সেটাই করবে। এই ব্যবস্থা সব মানুষকে যথেষ্ট সুযোগ দেবে, যথেষ্ট অধিকার দেবে, বা দিতে বাধ্য হবে, কারণ তার জোটে মানুষের সংখ্যা কম, সে কাউকে অবহেলা করলে তার ক্ষতি, তার উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষতি।

কারিগরি উৎপাদন কেন্দ্রিক সমাজে উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা মানুষের সামাজিক উত্তরনের মূল রসদ। নতুন চিন্তা, সৃজনশীলতা এই ব্যবস্থার প্রধান চালিকাশক্তি। অন্য সব পরিচয় ছাপিয়ে সমাজ বিকাশে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ সর্বোচ্চ সম্মানীয়। সৃজনশীল সমাজে মৌলবাদ বাঁচতে পারে না। কারণ মৌলবাদ সব সময় স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে থাকে। যা কিছু 'পূর্বের ন্যায় নয়' যা কিছু নতুন, মৌলবাদের কাছে তা - 'অন্যায়'। মৌলবাদ সব কিছু 'অব-লীলায়' করতে চায়, লীলাকে সে সব সময় ভয় পায়। কারণ লীলা সব সময় নতুন, চমকপ্রদ তাই মৌলবাদের কাছে তা অস্বস্তিকর। অথচ সৃজনশীলতা সব সময় নতুন কিছু সৃষ্টি করে, নতুন চমক তৈরি করে, তাই সৃজনশীল সমাজ মৌলবাদকে পরাস্ত করতে পারে। মৌলবাদ পরাস্ত হলেই সমাজ নিগড় মুক্ত হবে। মানুষ খোলা হাওয়ায় স্বস্তির শ্বাস নিতে পারবে। মানুষ জানবে তার কোন কাজ তাকে দেবে সামাজিক সম্মান। ভাল মন্দের ফারাক সে করতে পারবে অনেক সহজে। রাষ্ট্রীয় আইনের জুজুবুড়োর সামনে তাকে গুঁটিয়ে থাকতে হবে না, কারণ সে জানে - যা কিছু সমাজের কাজে লাগবে, সেটা করাই সব থেকে সহজ, কারণ সমাজ তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে সব রকম সাহায্যের হাত। সামাজিক উৎপাদনশীলতায় আস্থাশীল সমাজে বিকশিত হবে সামাজিক গণতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় নজরদারী, রাষ্ট্রীয় পাহারাদারির গুরুত্ব ও প্রয়োজন ক্রমাগত ক্ষীয়মান হবে।

কারিগরি উৎপাদন মানবিকতার বিকাশে কতদূর পর্যন্ত সহায়ক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নারী সমাজ। নারীরা প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদক তো বটেই, আমাদের সমাজে নারীদের সামাজিক বিকাশও হয় উৎপাদক হিসেবে, তাঁরা জন্মজ কারিগর। যে কোনও সাধারণ উপাদানের সংশ্লেষে প্রতিটি ঘরে ঘরে তারা যে অসাধারণ উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যান তার কোনও তুলনাই চলে না। নারীদের সৃজনশীলতা প্রজ্ঞা ধৈর্য অভিজ্ঞতা জ্ঞানভাণ্ডার কী বিপুল বিকশিত হয়েছে তার পরিমাপ কি গার্হস্থশ্রমের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন দিয়ে আদৌ করা সম্ভব! প্রতিটি কারিগরি উৎপাদনের হাতের ছোঁয়া কারিগরকে যত্নশীল করে, ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে বিলীন করে। প্রতিদিনের কারিগরি উৎপাদন নারী সমাজের মানবিক বিকাশকে কত দিক থেকে নির্ণায়ক করেছে, তার অতি সামান্য খোঁজ খবরই বিস্ময়কর। একটা সামান্য পরিসংখ্যান - পৃথিবী জুড়ে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তার ৯৬ শতাংশ ঘটায় পুরুষরা, মাত্র ৪ শতাংশ এর দায় নারীদের। তাদের এই সহনশীলতা ও মরমি মনের বিকাশে তাদের প্রতিদিনের হাতে হাতে গড়ে তোলা সাংসারিক উৎপাদনের সংবেদন নিয়ত সক্রিয়। তাই নারীর কারিগরি উৎপাদনের প্রভাব পারিবারিক গণ্ডীর ছাপিয়ে সমস্ত বসুধায় পরিব্যপ্ত।

কারিগরি উৎপাদনের বিকাশ কি সত্যিই এত কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে? খেয়াল করুন আন্তর্জাতিক কাঁটাতারের সীমানা কাদের কাছে বাঁধা আর কাদের কাছে বাঁধা নয়। এক দেশের শিল্পপতিরা অন্য দেশে গিয়ে শিল্প স্থাপন করে, বড় ব্যবসায়ীরা করে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার কারো অন্য দেশে গিয়ে কাজ করার বাঁধা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরাও দিব্যি বিভিন্ন দেশে গিয়ে পড়াশুনা করে। শ্রমিকরাও একদেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে কারখানায় কাজ করে। এমন কি বিয়েও হয় একদেশের ছেলের সাথে অন্য দেশের মেয়ের। শুধু অনুমতি পায় না - কারিগর আর হকাররা। বাকি সবাই অনুমতি পায় শুধু এদের বেলায় এত বাঁধা কেন? কারণ রাষ্ট্র নির্মিত দক্ষতার মাপকাঠিতে এদের মাপা যায় না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অকেজো

হয়ে যায় কারিগরদের সৃজনশীলতাকে পরিমাপ করতে। তাই রাষ্ট্র ও তার ধ্বজাধারীদের শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সব চেয়ে কার্যকরি হাতিয়ার কারিগরের কারিগরি।

কারিগর কৃষক হকার এই যৌথতা সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক বিপণনের তিন সর্বোত্তম সমাবাহু ত্রিভূজ যা একে অপরের সাথে জুড়ে যে কোনও সামাজিক মানচিত্রকে সব থেকে নিখুঁত ভাবে ধারণ করতে পারে। সামাজিক যৌথতার বিকাশই মানব সভ্যতার অধিকাংশ সমস্যার সমাধান।

প্রথম যে আদিম মানুষ হাতের নাগালের বাইরের কোনও ফলকে পাড়বে বলে হাতে তুলে নিয়েছিল মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল, অপ্রয়োজনীয় শাখাগুলোকে ভেঙে নিয়ে ফল পাড়ার উপযোগী করে নিয়েছিল, সেই মুহূর্তে সেই গাছের ডালটা হয়ে উঠেছিল একটা হাতিয়ার, আর সেই আদিম মানুষ হয়ে উঠেছিলেন - প্রথম কারিগর। আজও আমরা সেই কারিগরের উত্তরসূরী। ধরিত্রীর সুস্বাস্থ্যর দোহাই, কারিগরি উৎপাদনই আমাদের বাঁচাবে, বিকশিত করবে।

আপাতত দাঁড়ি

আরও বহু বিষয়ের আলোচনা বাকি তবুও আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে। আপনাদের প্রত্যকের অংশগ্রহন, সমালোচনা, প্রশ্ন আমাদের সমৃদ্ধ করুক। প্রত্যেক পাঠককে সাদর আমন্ত্রণ - প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজতে সাহায্য করুন। মনে করিয়ে দিই - এই ইস্তেহার অসম্পূর্ণ এটাই এই ইস্তেহারের সব চেয়ে বড় শক্তি। আরও যোগ্যতর লেখক এই সামান্য কলমচির অপূর্ণতাকে আরও অন্তত কিছুটা পূর্ণ করার দায়িত্ব নেবেন এই আশায় - অসম্পূর্ণ ইস্তেহারের এই পর্বের দাঁড়ি টানছি।

এক অসম্পূর্ণ ইস্তেহার২০২৩
আলোচনার কপিরাইট নেই,
ফোন/হোয়াটসঅ্যাপ – 9933970598
ই-মেইল – artistsamik@gmail.com

অপ্রাতিষ্ঠানিক আত্মনির্ভর ‘হকার-কারিগর অর্থব্যবস্থা’ বিনাশের প্রয়াস

দীপঙ্কর দে

[অর্থনীতিবিদ দীপঙ্কর দে-র লেখাটি বিস্তৃতভাবে সংকলিত রয়েছে কলাবতী মুদ্রা থেকে প্রকাশিত তার বই বিশ্বরাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া, সবুজায়ন ও নীল আর্থব্যবস্থার বিকাশ: এক নীলকণ্ঠ ভারতের ইতিবৃত্ততে। ইউপিএ সরকারের শেষ বছরে ২০১৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর The street vendors (protection of livelihood and regulation of street vending) Bill লোকসভায় পাস হয়। এই আইনে শহরের পথব্যবসায়ী হকাররা স্বীকৃতি পেলেও রেলস্টেশনে কর্মরত হকাররা অন্তর্ভুক্ত হননি। অর্থনীতিবিদ দীপঙ্কর দের মতে, ‘চলমান’ হকাররা শহরের সুদৃশ্য আধুনিক বিপণির প্রতিযোগী নয় বলে এই বিপুল সংখ্যক রেলহকারদের সেই আইনে অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি। সেই ভুলের খেসারত এখনও মেটাতে হচ্ছে রেলহকারদের, আরপিএফের নৃশংস আচরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। প্লাস্টিক বোতলে জল-সহ বাকি বেশ কিছু রেলহকারদের বিক্রি করার জিনিস আদপে কর্পোরেট পণ্য যা মজুতদারের হাত ধরে এলাকায় সাপ্লাই হচ্ছে। চর্চা-দলের প্রতিনিধিরা রেলহকারদের সমীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন আরপিএফের মদতে যে বড় বড় স্টল স্টেশনে গজিয়ে উঠছে, যারা ব্যাপক পুঁজি এবং সস্তার কর্মচারী লাগিয়ে রেলেও পণ্য বিক্রি করাচ্ছে তা মূলত কর্পোরেট আওতায় থাকা ব্যবসা, কারণ যে নামেই স্টল হোক তার গোটা পণ্যের সরবরাহ-মাধ্যম, জোগানদার বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। ফলে ঘুরপথে খুচরো ব্যবসায়, কর্পোরেটের অনুপ্রবেশের এও একটা রাস্তা। এই কারণেই ‘স্কিল’ থেকে ‘নলেজ’- কারিগরী ব্যবস্থার এই অভূতপূর্ব পারম্পরিক বির্বতনের তাত্ত্বিক দীপঙ্কর দে-কে আমরা পুনঃপাঠ করতে চেয়েছি। কারণ, তিনি ‘আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন শৃঙ্খলে’ হকার-কারিগরদের আটকে যাওয়ার কথা বহু আগেই বলেছিলেন। তার অনুমতিক্রমে চর্চাদল লেখাগুলির পুনঃপ্রকাশ ঘটালো - সম্পাদক]

অপ্রাতিষ্ঠানিক আত্মনির্ভর ‘হকার-কারিগর অর্থব্যবস্থা’ বিনাশের প্রয়াস

পারিবারিক ছোট উদ্যোগ বা গোষ্ঠীশ্রমে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন জামাকাপড়, বাসনকোসন, খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী, গৃহস্থালির টুকিটাকি ইত্যাদির উৎপাদন ও বিপণনের এক বিশাল কর্মকাণ্ড এ দেশে গড়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। ফেরিওয়ালা ও ছোট দোকানদার এই আর্থব্যস্থার চালিকাশক্তি। জয়নগরের মোয়া, সাদপুরের মাদুর, ফুলিয়ার শাড়ী বা কাশ্মীরের শাল, ফেরিওয়ালার কাঁধে চেপেই পৌঁছে যায় গ্রামের হাটে, শহরতলির বাজারে, বড় শহরের ফুটপাতে আর গৃহস্থের ঘরদোরে। সাধারণ মানুষের উদ্যোগে ও সার্বিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই নিত্য প্রয়োজনীয় আত্মনির্ভর আর্থ-ব্যবস্থাকেই বলা যায় হকার-কারিগর আর্থ-ব্যবস্থা।

পারম্পরিক প্রযুক্তি ও কারিগর নির্ভর বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা

বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমি শিক্ষার সুবাদে স্বদেশি, বিদেশি প্রযুক্তি বলে আলাদা কিছু হয় না। প্রযুক্তিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - যে প্রযুক্তি বিদ্যুৎ নির্ভর নয়, কারিগর নির্ভর, স্থানীয় জ্ঞান নির্ভর; আর যে প্রযুক্তি বিদ্যুৎ নির্ভর, স্থানীয় জ্ঞান নির্ভর নয়।

ভারতে এখনও সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয় নি। তবে সেখানে কোনও না কোনও উৎপাদন ব্যবস্থা যা হয়ত হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, টিকে রয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার ছাড়াই।

যে প্রযুক্তি বিদ্যুৎ ব্যবহারে অপরিহার্য নয়, তাকে আমরা গ্রামীন বা পরম্পরাগত প্রযুক্তি বলছি। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের অনেক আগে স্রেফ একটা সুতোর কাঠি আর বাঁশের তাঁত দিয়ে বাংলার কারিগরেরা বিশ্বজয় করেছে।

স্থানীয় জ্ঞান ও কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থা এখনও এ দেশের চালিকা শক্তি। এই বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা পুঁজি নিবিড় নয়। কারিগর আর তার চেলার (শিষ্য, সাকরেদ) সম্পর্ক পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মত নয়, মার্কস বর্ণিত শ্রম লুঠের এখানে নেই।

কারিগর তার সাকরেদকে শ্রমের বিনিময়ে মজুরি আর জ্ঞান বিতরণ করেন এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেন। ক্রমে সাকরেদ নিজেই একজন কারিগরেও পরিণত হয়ে গুরুস্থানীয় হয়ে ওঠেন। এইভাবেই কারিগর নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সম্প্রসারিত হয়, একাধজিক প্রতিযোগী কারিগরির উপস্থিতির ফলে একচেটিয়া মুনাফা বা বাজার দখল এই বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। এই কামনীয়, বহনীয় ও সুলভ প্রযুক্তি নির্ভরতাইপারম্পরিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের মূল শক্তি।

হকার কারিগর আর্থব্যবস্থা

এ দেশের হকার আর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন বর্ণিত, অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে অনেক বিক্রেতা (ফেরিওয়ালা, ছোট দোকানদার অনেক উৎপাদক (ক্ষুদ্র ও অতি-ক্ষুদ্র উৎপাদক, হস্তশিল্পী), হাজারো ক্রেতা। সিংহভাগ বিক্রেতার নিজস্ব কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, নেই কোন বিধিসম্মত ছাড়পত্র বা লাইসেন্স। উৎপাদক নিজেই কখনও বা বিক্রেতা। তারও অনেক ক্ষেত্রেই কোন আইনি ছাড়পত্র বা উৎকর্ষের শীলমোহর নেই। ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিশ্বাস নির্ভর। কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা ক্রেতা সুরক্ষা বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ আর্থব্যবস্থা বহুজাতিক বৃহৎপুঁজি বা ব্যাংকিং পুঁজির আওতার বাইরে ক্ষুদ্র পুঁজি নির্ভর এক স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা। অবশ্য ক্ষেত্রে বিশেষে ঘুর পথে এ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হয় বেআইনি নিয়মে। পুলিশ, সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় মস্তান ও রাজনৈতিক নেতাদের দালাল চক্র নানা অছিলায় সিধে আদায় করে। খবরে প্রকাশ, কলকাতায় ফেরিওয়ালারা তাদের লেনদেনের তিন শতাংশ নিয়মিত ঘুষ বাবদ দিতে বাধ্য হন এই চক্রকে।

২০০৪ সাল নাগাদ 'হকার সংগ্রাম কমিটি' শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ২৩০৬ জন স্থির হকারের একটি সমীক্ষা করে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে---

(১) সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭৪.৭১ শতাংশ ফেরিওয়ালা জানিয়েছেন যে তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণ সম্পূর্ণভাবেই এই পেশার উপর নির্ভরশীল;

(২) সে সময় (২০০৪) মাত্র ২৮.৭৮ শতাংশ ফেরিওয়ালা কোন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন;

(৩) ৬৬.৯১ শতাংশ ফেরিওয়ালা বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন;

(৪) ৮২.৫২ শতাংশ ফেরিওয়ালা সে সময় অন্তত ২ জন সহযোগী নিয়োগ করেছেন;

(৫) ৭০ শতাংশ ফেরিওয়ালা পারিবারিক পুঁজিতে ও মাত্র ০.৪৩ শতাংশ ফেরিওয়ালা ব্যাংক ঋণ জোগাড় করে এই পেশা শুরু করেন। ৭৪.৮৪ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল) তারা নিজেরাই জোগাড় করেন;

(৬) ৯০.১৬ শতাংশ বিক্রিত পণ্যই ছিল স্থানীয় উৎপাদিত।

এমন একটি আত্মনির্ভর আর্থব্যবস্থা ভাঙতে না পারলে বৃহৎ পুঁজির বিকাশ থমকে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুলিশ দিয়ে ভাঙলে রাজনৈতিক সমস্যা বাড়ে। তাই পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। না ভেঙে কব্জা করা - সহযোগী করে তোলা - বৃহৎ পুঁজির নির্ধারিত নিয়মে।

হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রেক্ষাপট ও তার বিভিন্ন ধারা উপধারা

বড় শহরের পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে ফেরিওয়ালাদের সম্পর্ক কখনই মধুর ছিল না - ব্রিটিশ ভারতেও নয় বা স্বাধীন ভারতেও নয়। শহরের রাস্তায়, ফুটপাতে, হকারের উপস্থিতি প্রশাসন যেমন মেনে নিতে পারেনি, তেমনি অস্বীকারও করতে পারেনি। রাষ্ট্র জানে বিশাল সংখ্যক নাগরিক এই অর্থকরী কর্মকান্ডে জড়িত ফেরি বিক্রেতা হিসেবে নয়, ক্রেতা ও ক্ষুদ্র উৎপাদক হিসেবেও। তা সত্ত্বেও সরকার সম্ভবত চারটি কারণে হকারকে স্বীকৃতি দিতে চায় নি---

(১) সংগঠিত মধ্য ও বৃহৎ বিক্রেতাদের বাধায়;

(২) লক্ষ লক্ষ স্থির, ভ্রাম্যমান ও চলমান ফেরিওয়ালাদের প্রশাসনিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার অক্ষমতায়;

(৩) শহরের পাবলিক প্লেস - যেমন ফুটপাত ও পার্ক সুন্দর রাখার তাগিদে;

(৪) জনপরিসর সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে।

তাই স্বভাবতই হকার ও রাষ্ট্রের সংঘাত বেধেছে, হকাররা বারবার উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের কর্মস্থল থেকে। কখনও রাতের অন্ধকার, কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিয়েছে তাদের অস্থায়ী ঠিকানা। এক রাস্তার মোড় ছেড়ে তারা বসেছেন অন্য রাস্তার মোড়ে, এ বাজার ছেড়ে অন্য বাজারে। এভাবেই বাজার চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

দু'দশক আগে বিশ্বপুঁজির আরাধনায় রাষ্ট্র সৌন্দর্যায়নে মন দেয়। বৃহৎ পুঁজি নয়নের মণি তার। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের এ যুগে বিশ্বপুঁজির দেশের দেশীয় বৃহৎ পুঁজি। বাজারের পরিধি বাড়াতে চায় তারা - ছোট মাঝারি কোন ক্রেতাকেই আর ছাড়লে চলবে না। সংগঠিত এই বৃহৎ পুঁজির চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্র আরও কঠোর হয়েছে। বাম শাসনেও এই রাজ্যও পিছিয়ে ছিল না। কলকাতা করপোরেশন Kolkata Municipal Corporation (Second Amewndment) Bill 1997 যা পরে আইনে পরিণত হয়ে হকারিতে নানা বিধিনিষেধের সুপারিশ করে। সে আইনের ৩৭১ ধারা মোতাবেক, ক্ষেত্র বিশেষে, রাজপথে হকারি বেআইনি ও জামিন-অযোগ্য অপরাধ বলে ধার্য করা হয়।

কঠিন আইন প্রণয়নের সাথে সাথে রাষ্ট্র সন্ত্রাসের পথও বেছে নেয় যাতে হকাররা রণে ভঙ্গ দেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে এক গভীর রাতে কলকাতা-গড়িয়াহাট ও শ্যামবাজারে অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্র হকারদের অস্থায়ী দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এ অভিযানের পোশাকী নাম ছিল 'অপারেশন সানশাইন'। অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে বৃহৎ পুঁজির শুভাগমনের সূচনা। ঘটনার প্রায় এক দশক পর তৎকালীন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার একটি দৈনিক (দৈনিক স্টেটসম্যান ৯.২.০৭) আক্ষেপ করে লিখেছেন,'অপারেশন সানশাইন' এর নামে হকার উচ্ছেদের পর তৎকালীন সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যদিও পুলিশ, অন্যান্যদের সহায়তায় বিকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনা আগেই তৈরি করে রেখেছিল। এতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেই চেয়েছিল সে রাতে।

কিন্তু হকাররা আর যাবে কোথায়? উৎখাত হতে হতে পথে এসে দাঁড়িয়েছে তারা।

বিকল্প আর কোন পথ জানা নেই তাদের। অগত্যা তারা জোট বাঁধে, রুখে দাঁড়ায়। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের একাংশ তাদের সমর্থনে পথে নামে, আইন সাহায্য করে, সাহস যোগায়। রাষ্ট্র সাময়িকভাবে পিছু হটাতে বাধ্য হয়। বৃহৎ পুঁজির সঞ্চালকরা বুঝতে পারে, এই একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জোরে সব কার্যসিদ্ধ হবে না। অন্য পথ নিতে হবে। যাকে বশে আনা যাবে না, তাকে করায়ত্ত করতে হবে নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে। এভাবেই বিশ্বব্যাপী শুরু হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নানা উদ্যোগ। তারই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত হয় 'শোভন কাজ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার' প্রস্তাব।

বিশ্বায়নের এই নবপর্যায়ে গত প্রায় দু দশক যাবত পৃথিবীর বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা অর্থকরী কার্যকলাপ-কে, তা অংগঠিত শিল্প বা পরিষেবা যাই হোক, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এক পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে - সরকারি স্তরে। স্বভাবতই ভারত সরকার এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৪ সরকার প্রণীত The Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Act 2014 উক্ত প্রয়াসের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

এ আলোচনা মূলত দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে -

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা ও হকার আর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(খ) হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রেক্ষাপট ও তার বিভিন্ন ধারা উপধারার, বিশেষ করে নেতিবাচক অংশের আলোচনা।

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা ও 'হকার আর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য'

বলা হয় হকারি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা। এর মানে কী? অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র আর অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা কি সমার্থক? হকারিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র বলা হবে না কেন? ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের একটু শিবের গীত গাইতে হবে।

২০০২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ILO তাদের ৯০ তম সভায় (90th International Labour Conference) 'শোভন কাজ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা' (Informal Economy) নামে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে কোনো 'শোভন কাজের চারটে প্রাথমিক শর্তই - যেমন অধিকার (Rights) কর্মসংস্থান (Employment), সামাজিক সুরক্ষা (Social Protection) এবং সংগঠন ও সামাজিক মত বিনিময় (Organization and Social Dialogue) - একে অন্যের পরিপূরক। তাই উক্ত সভা মনে করে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার নানাবিধ গভীর সমস্যার সমাধানে ও 'শোভন' কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন একটি সুসংহত ও সমন্বিত পদ্ধতি (Comprehensive and Integrated Approach)। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা প্রথামুক্ত ব্যবস্থার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে সমস্ত 'অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র'কে অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার' (Informal Economy) অন্তর্গত করে। এভাবেই স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা একটি আর্থব্যবস্থাকে 'সংজ্ঞা'র কাঠামোয় বেঁধে ফেলে শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া।

অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থার সংজ্ঞাটা কেমন? সংক্ষেপে বলা যায় সেই সমস্ত অর্থকরী কার্যকলাপ যা প্রথাগতভাবে চুক্তিবদ্ধ নয়। (All economic activities by workers and economic units trhat are in law or in practice not covered or inefficiently covered by formal arrangements. THeir activities are not included in the law, or they are not covered in practice with means that although they are

operating within the formal reach of the law, the law discourages compliences because it is inappropriate, burdensum or imposes execessive costs.)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন জানাল যে অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ অপরাধমূলক বা বেআইনি (যেমন চোরাচালান বা নিষিদ্ধ দ্রব্য পাচার) কার্যকলাপ নয়। স্রেফ প্রথাগতভাবে চুক্তিবদ্ধ নয়, এই যা। বিশদ আলোচনায় আরও বলা হল যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থা সমান্তরাল দুইটি আর্থব্যবস্থা নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক। তাই এই দুই আর্থব্যবস্থার যোগসূত্রগুলো চিহ্নিত করে এদের পারস্পরিক নির্ভরতা আরও সুদৃঢ় করা আশু প্রয়োজন।

এবার আমরা বুঝতে চাইব অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এই উদ্যোগ কেন? প্রধান কারণ, পণ্য ও শ্রম বাজার করতে চায় রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজি। অনুমান করা হয় ২০০৫ সালে শুধু কলকাতা শহরের হকারদেরই বাৎসরিক লেনদেন এর পরিমাণ ছিল ৮০০০ কোটি টাকারও বেশি। এ বাজার দখল করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বহুজাতিক পুঁজি এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হয়েছে এবার। সরকার তার সহযোগী মাত্র। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সহায়তায় বৃহৎ পুঁজি শ্রমবাজারের পরিধি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চাইছে স্বাভাবিকভাবেই। হালে লক্ষ্য করা গিয়েছে কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিক, যারা এমনকী কোন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনেরও আওতাধীনও নন, তারাও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর থেকে অধিক মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছেন। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের সংঘবদ্ধ শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের সুযোগসুবিধে ও মজুরি বাড়াতে তেমন সফল হচ্ছে না। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত কয়েক বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমবিরোধ কমেছে লক্ষণীয়ভাবে।

তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বশে আনতে রাষ্ট্র ও পুঁজি দু'পক্ষই উৎসাহী এখন। হকার আর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য শুরুতেই আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন হকার বলতে আমরা কাদের বুঝি এবং এই হকার আর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই বা কী?

হকার বা ফেরিওয়ালা তাদেরই বলা হয় যারা রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রামে, ফুটপাথে বা কোনো অস্থায়ী চালাঘরে তাদের পণ্য সামগ্রী বা পরিষেবা সাধারণের কাছে বিক্রি করেন। মোটামুটি তিন ধরনের ফেরিওয়ালার দেখা মেলে--- (১) স্থির ফেরিওয়ালা - যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোনো অস্থায়ী চালা বানিয়ে নিয়মিত পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করেন। এদের অনেকেই স্থানীয় পুরসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা কোন সংগঠন অথবা প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ার আশ্রিত; (২) ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা যারা পায়ে হেঁটে দাঁড়িয়ে, ঝাঁকা মাথায় বা রেলগাড়িতে ফেরি করেন; (৩) চলমান হকার এরা বিভিন্ন স্থানে, কখনও সাইকেলে, বাসে বা রেলগাড়ির কামরায়, ফেরি করেন সারাদিন।

কত লোক এই পেশায় যুক্ত? অনুমান করা হয় ভারতের বড় বড় শহরের মোট জনসংখ্যার দুই শতাংশ মানুষ এই পেশায় যুক্ত। বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১.৪১ কোটি (২০১১ আদমসুমারী অনুযায়ী) ধরলে এই শহরে ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় ২.৮ লক্ষ। ফেরিওয়ালার সংখ্যা অনুমান করা কঠিন। কারণ ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের আর্থব্যবস্থায় এখনও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তথাকথিত অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় কর্মরত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূলত তিন ধরনের পন্থা গ্রহণ করতে হয় - যা একে অপরের পরিপূরক। (১) অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ যুক্ত কারিগরদের (যেমন ছুতোর, তাঁতি, মুচি, কুমোর

ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান; উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করা, ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি; (২) অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে (যেমন স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা) অন্তর্ভুক্ত করা; (৩) অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা।

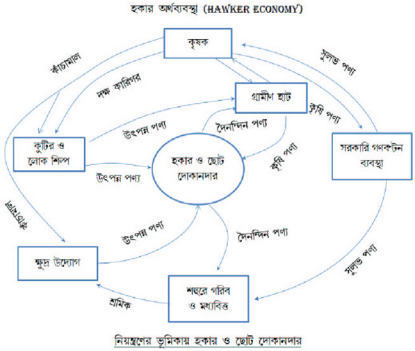

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সুপারিশ মতে ভারত সরকারও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করার পথে অগ্রসর হয়। সংঘর্ষের পথ ছেড়ে নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নেয় রাষ্ট্র। এই উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালে 'ন্যাশনাল পলিসি অন আরবান স্ট্রিট ভেন্ডার' নামে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করে। দীর্ঘ পাঁচবছর আলাপ আলোচনার পর ২০০৯ সালে সরকার জাতীয় হকার নীতি(National Policy on Urban Street Vendors 2009) প্রণয়ন করে। উক্ত হকার নীতিতে রাষ্ট্র হকারদের 'অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ' (Micro-enterprise) হিসেবে অভিহিত করে। হকারদের 'অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি' বলে চিহ্নিত করে তাকে 'আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন' প্রক্রিয়ার (Global Supply Chain) সাথে জুড়ে দেওয়ার এই সরকারি প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফেরিওয়ালা এবার নিজেকে শ্রমিক ভাববে না - মনে প্রাণে সে হয়ে উঠবে বিশ্বপুঁজির অংশীদার - যত ক্ষুদ্রই হোক সে অংশ! ঠিক এভাবেই গত দুদশকে মধ্যবিত্তের এক বিশাল অংশকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে তাদেরকেও বৃহৎ পুঁজির অতিক্ষুদ্র অংশীদার করা হয়েছে। শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলে তারা এখন স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত হন। শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত, পুঁজি আর শ্রমের বিরোধে কোন পক্ষ বেছে নেবেন বুঝে উঠতে পারেন না এখন। উক্ত হকারনীতিতে ফেরিওয়ালাদের ফটো আইডেনটিটি কার্ড প্রদান, 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি' হিসাবে তাদের কারগরি ও কারবার সংগঠন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা প্রণয়নের উল্লেখ আছে।

জাতীয় হকার নীতি প্রণয়নের চার বছরের মাথায় ২০১৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর The Street Vendors (Protection od Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill 2013 লোকসভায় পাশ হয় এবং গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাজ্যসভাও তাতে সম্মতি দেয় ও রাষ্ট্রপতি অনুমোদনের পর মার্চ মাসে তা আইনে পরিণত হয়।

এই আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল---

(১) শহরের হকারের সংখ্যা সেই শহরের মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে;

(২) রেলগাড়ী ও রেল স্টেশনে কর্মরত হকাররা এই আইনের আওতাভুক্ত নন ('চলমান' হকাররা শহরের সুদৃশ্য আধুনিক বিপণির প্রতিযোগী নয় বলে?)

(৩) Town Vending Committee(TVC) যেখানে হকার সংগঠনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, সেই শহরের হকার স্বার্থরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(৪) শহরের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় (Vending Zone) ফেরি করা যাবে। কোথায় ফেরি করা যাবে বা যাবে না, তা নির্ধারণ করবে Town Vending Committee(TVC);

(৫) TVC শহরের সব বর্তমান হকারের সমীক্ষা করে তারা যাতে 'ভেন্ডিং জোন'-এ ফেরি করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবে। উক্ত হকারদের লাইসেন্স প্রদান করা হবে;

(৬) প্রতি পাঁচ বছরের মাথায় TVC অনুরূপ সমীক্ষা করবে। যদি কোন নতুন হকার উক্ত দুটি সমীক্ষার অন্তর্বর্তী সময়ে ফেরি করতে চান তবে তাদের TVC-র কাছে আবেদন করতে হবে। TVC অনুমতি দিলেই তিনি শহরে ফেরি করতে পারবেন;

(৭) সব লাইসেন্স প্রাপ্ত হকারকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে TVC হকার লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে;

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্ত হকার TVC নির্ধারিত সীমা রেখার মধ্যে ফেরি করতে পারবেন। 'নো ভেন্ডিং জোন' বা অন্য কোনো স্থানে ফেরি করা যাবে না;

(৯) পৌর কর্তৃপক্ষ TVCর সম্মতক্রমে জনস্বার্থে যে কোন 'ভেন্ডিং জোন'কে 'নো ভেন্ডিং জোন' বলে ঘোষণা করতে পারবে;

(১০) পৌর কর্তৃপক্ষ সেই সব হকারদের উচ্ছেদ করতে পারবে যাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা যাদের ফেরি করার কোন অনুমতিপত্র মেলেনি;

(১১) পৌর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারী কোন হকারকে স্থানান্তরিত করতে চাইলে বা কোন কারণে উচ্ছেদ করতে চাইলে অন্তত তিরিশ দিনের আগাম নোটিশ জারি করতে হবে। নোটিশ জারির সময়সীমার মধ্যে উক্ত হকার জায়গা ছেড়ে না দিলে কর্তৃপক্ষ বল প্রয়োগ করে (Physically) তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে। প্রয়োজনে হকারের পণ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

(১২) কোনটি 'স্বাভাবিক বাজার' (Natural Market) যেখানে বহুদিন ধরে ক্রেতা বিক্রেতা কেনা বেচা করেন, TVCর সুপারিশক্রমে তা নির্ধারণ করবে স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ;

(১৩) এ ছাড়া পুলিশি হেনস্থা রোধ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ঋণ, বিমা ও নানা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের কথাও উক্ত আইনে বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরি করার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে;

(১৪) হকার নিয়ন্ত্রণে TVCকে বিশাল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মূলত এই কমিটিই শহরের হকারদের হর্তাকর্তা বিধাতা। দেখা যাক এই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন TVC কমিটিতে কারা থাকবেন ও কীভাবেই বা তারা মনোনীত হবেন। বলা হয়েছে TVC তে মূলত থাকবেন - পৌর অধিকর্তা (Municipal Commissioner) - তিনিই হবে TVCর সভাপতি। অন্য সদস্যরা মনোনীত হবেন বিভিন্ন সংস্থা থেকে। যেমন পৌর প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা ও পরিকল্পনা বিভাগ, পুলিশ, হকার সংগঠন, বাজার সমিতি, বণিকসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সংগঠন ও ব্যাংকের প্রতিনিধিরা TVCর সদস্য হবেন। আইনে আরও বলা হয়েছে যে TVCতে স্বেচ্ছাসেবী ও নাগরিক সংগঠনের যৌথ প্রতিনিধিত্ব ন্যূনতম ১০ শতাংশ হতে হবে এবং হকার সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ন্যূনতম ৪০ শতাংশ। হকার প্রতিনিধিরা সংগঠনের সভ্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং উক্ত প্রতিনিধিদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ হবে মহিলা। তাছাড়া তপসিলি জাতি, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে TVCতে হকার প্রতিনিধিদের দলে।

তা হলে কী দাঁড়াল? যে TVC শহরকে 'হকিং' বা 'নো হকিং' জোনে ভাগ করবে, কোন হকার লাইসেন্স পাবে বা না পাবে (পেলেও কোথায় ফিরি করবে তা ঠিক করবে, স্বাভাবিক ভাবে গজিয়ে ওঠা বাজার (Natural Market) থাকবে না বন্ধ হবে সে সিদ্ধান্তও

নেবে, সেই TVCতে হকারের প্রতিনিধিত্ব ৪০ শতাংশ। মানে তারা সেখানে সংখ্যালঘু। শুধু তাই নয়, জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজনের বীজও সচতুরভাবে রোপণ হয়েছে এ আইনে। হকার সংগঠনগুলো, যারা এই আইনের সপক্ষে সওয়াল করেছেন, দাবি করছেন যে TVCতে স্বেচ্ছাসেবী ও নাগরিক সংগঠনের ভোট (১০ শতাংশ) তাদের দিকেই থাকবে। কর্পোরেট পুঁজি চালিত বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার খবর আমরা সবাই জানি। তারাই যে TVCতে স্থান পাবে না তা কোন ভরসায় ভাবছে হকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ? এ আইনের ফলে নিরাপত্তার নামে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে একটি স্বাধীন স্বনির্ভর পেশা। এক অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থব্যবস্থাকে আগ্রাসী বিশ্বপুঁজির অতিক্ষুদ্র সহযোগীতে পরিণত করবে হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪।

রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা শুধু হকার নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়। খসড়া 'জাতীয় হকার নীতি ২০০৪' নিয়ে আলোচনা চলার ফাঁকে ভারত সরকার অপ্রাতিষ্ঠানিক কুটির ও লোক শিল্পকেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) প্রণয়ন করে। এভাবেই ভারতের লক্ষ লক্ষ কারিগর ও গ্রামশিল্পীদেরও 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি'তে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উক্ত আইন মোতাবেক উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে দুভাগে ভাগ করে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে পুঁজি বিনিয়োগের পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা স্থির হয়েছে দশ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা ধার্য হয়েছে পঁচিশ লক্ষ টাকা। এই সংজ্ঞা অনুসারে সব ছোট দোকানদার, হকার, গ্রামশিল্পীরা (পটুয়া, বাউল, কীর্তনিয়া ইত্যাদি), তাঁতি, মুচি, কুমোর সবাই এখন 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি'। হালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী কুটির ও গ্রামশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি সহায়তায় শিল্পমেলা সংগঠিত করে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যবিমা ও ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তদুপরি হাজার হাজার শিল্পীর সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাদের পঞ্জীকরণের এক বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্জীকরণই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর প্রাথমিক ধাপ। উন্নতমানের তথ্য প্রযুক্তির যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড, জিপিএস ম্যাপএর সাহায্যে এখন রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজির পক্ষে গ্রামশিল্পের মত অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে সহজেই।

এ দেশের হকার আর্থব্যবস্থায় গ্রামের কুটির শিল্প ও শহরের ফেরিওয়ালা একে অন্যের পরিপূরক। তাই রাষ্ট্র হকার আর্থব্যবস্থার এই দুই মূল স্তম্ভকে একই ভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে। শতাব্দী-প্রাচীন অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বনির্ভর একটি আর্থব্যবস্থা বিলুপ্ত হচ্ছে বৃহৎ পুঁজির সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে।

বিগত দুই দশক ধরে বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এ দেশে তার প্রধান চালিকা শক্তি আন্তর্জাতিক বিপণন শৃঙ্খল (Supply Chain)। এই বহুজাতিক বিপণন প্রক্রিয়ার জল বিশ্বময় ছড়ানো। দিন দিন তার পরিধি বিস্তীর্ণ হচ্ছে আর্থব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে নিচ্ছে যে।

এতদিন দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজার আবর্তিত হয়েছে অসংগঠিত হকারদের ঘিরেই। বিশ্বায়নের পথে প্রধান অন্তরায় সাধারণ মানুষের এই হকার আর্থব্যবস্থা যা এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দিয়ে এসেছে বহু যুগ ধরেই। একে না ভাঙলে বিশ্বায়নের ঘোড়া থমকে যাবে। তাই সুচতুর ভাবে এই হকার আর্থব্যবস্থাকেই আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আইনি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। শুধু শহরের হকারই নয়, এই প্রক্রিয়ায় দেশের লক্ষ লক্ষ স্বনিয়ন্ত্রিত কুটির শিল্পও ক্রমশ বহুজাতিক সংস্থার যোগানদারে পরিণত হবে।

ভারতের মত বিশাল ও বৈচিত্রময় দেশে চাইলেই এত সহজে আর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সহজ নয়। দু একটা আইন প্রয়োগ করলেই সব পালটে যায় না। রাষ্ট্র ও বৃহৎ পুঁজির কর্ণধাররা তা বিলক্ষণ জানেন। তাই খুব পরিকল্পিত ভাবে এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পনা করেই তারা আসরে নেমেছে। ১২০ কোটি লোকের বিশাল বাজার করায়ত্ত করতেই হবে, যত সময়ই লাগুক। আলোচ্য 'হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪' আসলে এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

নীল আর্থব্যবস্থার নির্মান

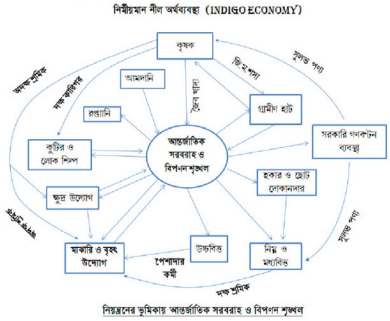

বিশ্বের অন্যতম প্রথম বহুজাতিক সংস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতকে বাংলার কৃষককে বাধ্য করেছিল নীল চাষ করতে। বাংলার জৈব নীল ইংলন্ডে রপ্তানি হত চড়া দামে। মুনাফা লুঠত সেই বহুজাতিক। এর পর যখন জার্মানির রাসায়নিক নীল বিশ্ববাজারে বাংলার জৈব নীলকে হঠিয়ে দিল, নীলকর সাহেবররা তখন নজর দিল অন্য ব্যবসায়। ফলে পথে বসল লক্ষ লক্ষ নীল চাষী। ভেঙে পড়ল বাংলার অর্থব্যবস্থা।

গতকয়েক দশক ধরে খুব পরিকল্পিতভাবেই স্বাধীন ভারতে নির্মান হচ্ছে একটি নীল আর্থব্যবস্থা(ইন্ডিগো ইকনমি)। এটি এমন একটি আর্থব্যবস্থা যা বিশ্ববাজারের চাহিদা নির্ভর। এই আর্থব্যবস্থা ধ্বংস করতে জৈব বৈচিত্র। কৃষক হারাচ্ছে বীজ নির্বাচনে মৌলিক অধিকার। স্বনির্ভর ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগকারী রূপান্তরিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সরহরাহ ও বিপণন প্রক্রিয়ার এক অতি সামান্য যোগানদারে(সঙ্গের ছবি)।পশ্চিমে দূষণকারী ভারী শিল্প স্থানান্তরিত হচ্ছে এ দেশে। জল, বায়ু, দৈনন্দিন খাদ্যে বাড়ছে বিষের কণা। এদেশের কোটি কোটি হাভাতে মানুষ প্রতিদিন এ বিষ ধারণ করছে তার শরীরে। পুরাণের মহাদেবের মত নীলকণ্ঠ হচ্ছে তারা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে স্মার্ট সিটি

১৭৫৭য় পলাশি যুদ্ধে (না চক্রান্ত?) এবং বক্সারের (১৭৬৪) যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আজকের পশ্চিমবঙ্গ, ওডিসা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের দেওয়ানি(কর আদায়ের অধিকার - তখন বিশ্বের বৃহত্তম আউটসোর্সিং প্রকল্প পায় দিল্লির সরকারকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এর পর থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসক হয়ে বসে। নবাবের হাতে রইল শুধু বিচার ব্যবস্থা। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। ১৭৯৩ সালে নবাব তার বিচার ক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে ভারতের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ পূর্ণতা পায়।

এই ইতিহাস কি নতুন করে ফিরে আসছে

অতীতের জেএনএনআরইউএম বর্তমানে প্রকল্প বা স্মার্ট সিটি মিশন যেভাবে বিকশিত হচ্ছে তাতে পরিস্কার শহর ভিত্তিক উন্নয়নের যে অন্তঃসারশূন্য মডেল স্বাধীনতার পর থেকে

সরকারগুলি দাঁড় করাতে চাইছে, তাতে আদতে ভারতকে ইন্ডিয়ার উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারত থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া অমিত সম্পদে ব্রিটেনের মোট উৎপাদন বেড়েছিল। ভারতের লুঠ হয়ে যাওয়া সম্পদে ব্যঙ্ক অব ইংলন্ড তৈরি হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার পরেও অনুসৃত হতে থাকল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি নীতিগুলি। মেট্রোপলিটনের স্বার্থ দেখার জন্য বড় পুঁজিপতি আর ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্ম দিয়েছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্র এবং কোম্পানি, তারা আজ বিশ্বের বড় পুঁজির স্বার্থরক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এদের প্রাথমিক কাজ হল গ্রাম ভারতকে ইন্ডিয়ার উপনিবেশে পরিণত করা। এই স্বার্থন্বেষীরা আজ ভারতে বিদেশি পুঁজি নিয়ে আসার কাজে বিভীষণের কাজ করছে। এই মানুষেরা তাদের দেশের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন, এরা নিজেদের প্রযুক্তি জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই স্মার্ট সিটি মিশন শুধু এই একরোখা, নাকউঁচু নব্য উপনিবেশের স্বার্থাদেখা মানুষদের স্বার্থরক্ষার চরম হাতিয়ারমাত্র।

বৃহৎ পুঁজির কবল থেকে কুটির ও গ্রামশিল্পকে রক্ষা করার সম্ভাব্য উপায়

রাষ্ট্র ও পুঁজি দুপক্ষই প্রথামুক্ত আর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক প্রযুক্তি তাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য - নাগরিক তার বশে থাকুক সেটাই চায় রাষ্ট্র। নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়ায় যে নাগরিকদের কিছু সুবিধেও দেয় (আমরাও যেমন সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটা ওটা কিনে দিই!) যেমন খাদ্যে ভর্তুকি, স্বাস্থ্য বিমা, সহজ ঋণ, আধার কার্ড করলে গ্যাসে ভর্তুকি ইত্যাদি। আর বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এক বিশাল বাজার করায়ত্ত করা তাগিদে, যা এখনও তার আয়ত্তের বাইরে, তাকে গ্রাস করার তাগিদে। তাই বৃহৎ পুঁজি রাষ্ট্রের সাথে হাত মেলায়, প্রযুক্তি ও অর্থ যোগান দেয়, তাদের অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্র ও পুঁজির যৌথ আক্রমনে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা আজ বিপন্ন। বাঁচার এই লড়াইয়ে প্রাথমিক কাজ রাষ্ট্র ও পুঁজির এই অশুভ আঁতাতে আঘাত করা। বৃহৎ পুঁজির দালাল, সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলা ও ইংরেজি জানা শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্তের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী রাষ্ট্রের দখল নিয়েছে আজ। শক্তিশালী মিডিয়াকে হাত করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে তাদের দলে টেনে নিয়েছে। নাগরিক অধিকার টিকিয়ে রাখতে হলে এই অশুভ গোষ্ঠীর কবল থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় উদ্যোগের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বৃহৎ পুঁজি নাগরিকদের সাথে রাষ্ট্রকেও আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছে আজ। কিন্তু হকার সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে আলোচ্য হকার আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে মনে হয় তারা রাষ্ট্রের বকলমে বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আমরা দেখেছি, কুটির ও লোকশিল্পকেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পালা শুরু হয়েছে পঞ্জীকরণের মাধ্যমে। নানা সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতেরই পারে, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভয়টা কোথায়? রাষ্ট্র যদি তার নাগরিককে সুরক্ষা দিতে নানা সুযোগ সুবিধে দিতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয় যখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বকলমে কুটীর ও লোকশিল্পকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করে। তাদের সার্বভৌম অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয়। বৃহৎ সরবরাহ ও বিপন্ন সংস্থাগুলো এই সব কুটীর ও লোক সামগ্রী নিজেদের বণ্ড্যান্ড হিসেবে বিক্রি করে। সেসব পণ্যের চাহিদা ও মুনাফা বেশি সেগুলোই তারা বেশি করে বিপণন করে। ফলে হারিয়ে যায় অনেক দক্ষ কারিগর ও বংশানুক্রমিক জ্ঞান।

ভারতের মত বিশাল দেশের বৈচিত্রপূর্ণ কুটির ও লোকশিল্প গুটিকয় বৃহৎ বিপন্ন

সংস্থার করায়ত্ত হলে বাজারের চাহিদা ও যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই। তাই সঙ্গতভাবেই মেধাস্বত্বের একচেটিয়া অধিকার পেতে পারে, অন্য কেউ তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করলে 'রয়্যালিটি' পেতে পারে, তবে লোকশিল্পীরা তাদের লৌকিক জ্ঞানএর স্বীকৃতি মূল্য পাবেন না কেন? জয়নগরের মোয়া যদি বাক্সবন্দি হয়ে আন্তর্জাতিক বিপণন প্রক্রিয়ায় বিদেশি বাজারে অধিক মুনাফার বিক্রি হয় তবে তার একটি অংশ জয়নগরের সেই পরিবারটি, যেখানে মোয়াটি বাঁধা হয়েছিল, তারা পাবে না কেন? যে তাঁতির কোনো কাপড় - 'ফ্যাব ইন্ডিয়া' বা 'মঞ্জুষা' তাদের সাজানো বিপণিতে চড়া দামে বিক্রি করে যে কাপড়ের প্যাকেটে, তাতে সেই তাঁতির নাম ঠিকানা থাকবে না কেন?

কুটির ও লোকশিল্পকে বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে তার স্বকীয় স্বত্তার বিশেষ জ্ঞানের স্বীকৃতি আদায় করতেই হবে। শিল্পী/কারিগরের নাম ঠিকানা থাকলে বৃহৎ বিপণন সংস্থাকে এড়িয়ে ভবিষ্যতে ক্রেতা বা ছোট বিক্রেতা সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কুটির ও লোকশিল্পকে রক্ষা করতে প্রাথমিক ভাবে অন্তত সরকারি বিপণন সংস্থায় (যেমন, খাদি গ্রামোদ্যোগ, মঞ্জুষা, বিশ্ববাংলা) বিক্রিত পণ্যে প্রস্তুতকরণের নাম ঠিকানা থাকা আবশ্যিক হোক।

লোকশিল্প বাঁচবে যদি চাষি স্বাধীনভাবে চাষ করতে পারে ও দেশের বিপুল কৃষি বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়। তা সম্ভব, যদি বহুজাতিক বীজ আর জল কোম্পানি থেকে চাষি আর বীজ আর জলের অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দিকে দিকে 'বীজ বাঁচাও জল বাঁচাও' আন্দোলনে সংগঠিত করা। যে কটা শস্য ও সবজি বীজ এখনও লুপ্ত হয়নি, অবিলম্বে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 'জল ধর জল ভর' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যাবে যদি না পাতাল জল উত্তোলনের হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হয়।

চাষি বাঁচলে, কুটির ও লোকশিল্প স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারলে, হকারও সুরক্ষিত থাকবে। তাই 'হকার বাঁচাও' আন্দোলনের পরিধি বিস্তীর্ণ করে একে 'হকার আর্থব্যবস্থা বাঁচাও' আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গ্রামের কণা-আলেয়া-ফুলটুসিরা না বাঁচলে শহরের শৈবাল-প্রমথেশরা বাঁচবে না। সর্বগ্রাসী পুঁজিকে ঠেকাতে বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়তেই হবে। নয়া কোন বিকল্প পথ জানা নেই আমাদের।

শুধু খেয়াল রাখতে হবে আসল লড়াইটা মেঘের সাথে নয়, মেঘের আড়ালে থাকা ইন্দ্রজিতের সাথে।

প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক পুঁজিবাদ ও আমরা - একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাবনা ।। অত্রি ভট্টাচার্য

প্রযুক্তিগত অতিনির্ধারণবাদের গভীর উপলব্ধি আমাদের বর্তমানের বৈশিষ্ট্য। ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্যোক্তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এই প্রযুক্তি আগামী বছরগুলিতে আমাদের বিশ্বকে কীভাবে পরিবর্তন করবে। সিলিকন 'ভাববাদী'রা আমাদের স্বয়ংক্রিয় এবং বায়োইঞ্জিনিয়ারড ভবিষ্যতকে বিলাসিতা এবং সুবিধার চকচকে ছবিতে কল্পনা করে। প্রযুক্তি অভ্যাসগতভাবে একটি বাহ্যিক শক্তি হিসাবে নিক্ষিপ্ত হয় যা তার নিজের ইচ্ছায় বিকাশ করে এবং এটির সাথে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। প্রায়শই 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন'-এর আহ্বান আমাদেরকে সচেতনভাবে আকার দেওয়ার পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তির চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করে। বামপন্থী রাজনীতিবিদদের নতুন পরিস্থিতি বোঝার সমস্যায়, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর একচ্ছত্র মালিকানা দাবি করছে। এখন আমরা (হকার-চাষী-কারিগরি ব্যবস্থার সমর্থকরা) একটি জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাদের হাতে প্রচুর হাতিয়ার কিন্তু সেগুলির পরিকল্পনা রূপায়নে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় শূণ্যের কোঠায়। আজ বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ হয়ে গেলেও, কোন শর্তে আমরা সংযোগ কাঠামো তৈরি করব সেই বিকল্পটাও আমাদের হাতে নেই। আমরা বিনামূল্যে ডিজিটাল প্লাটফর্মের পরিষেবা ব্যবহার করলেও ডিজিটাল প্রযুক্তি জীবন থেকে খুব কম শ্রমমূল্য অর্জন করি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার চেয়ে, এলন মাস্কের মঙ্গল গ্রহের উপনিবেশ তৈরির কল্পনা আমাদের কাছে সহজ। বিগ টেক 'বৈশ্বিক সম্প্রদায়'-এর ধারণা ছড়ায় এবং অন্যদের বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্বায়িত বিশ্বে যুক্ত হতে এবং পরস্পরকে খুঁজে পেতে সহায়তা ক'রে কোম্পানিগুলির স্বাস্থ্যকরতার চিত্র সামনে রাখে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগকে কাজে লাগানোর জন্য পরিশীলিত ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করেছে। একে শুধুই 'নজরদারী পুঁজিবাদ'-এর রূপ হিসাবে দেখার পরিবর্তে - একটি বিকল্প যুক্তিতে চালিত এবং পুঁজিবাদের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দেওয়া মানব জীবনের কেন্দ্রে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হিসাবে বোঝা দরকার। মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন প্রযুক্তি নিয়ে বিতর্কের মূলে ছিল না। বর্তমানে, অনেকের ধারণা বড় ডিজিটাল এপভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের প্রধান সমস্যা হল তাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন, একচেটিয়া অনুশীলন এবং নজরদারি প্রযুক্তি। আমাদের লক্ষ্যকে 'গোপনীয়তা, ডেটা এবং কাঠামো' থেকে 'ক্ষমতা, মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ'-এ পরিবর্তন করতে হবে। সমস্যার প্রথম সেট গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্ল্যাটফর্মের মালিক কে, সেসব কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং স্থিতাবস্থা থেকে কারা উপকৃত হয় সে সম্পর্কগুলি আজ গৌণ তর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি আজ প্রাইভেট কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত, অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য মুনাফা তৈরি করে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব এই কাঠামোকে বহু মানুষের উপকারে কৌম-সম্প্রদায় পরিচালিত ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করা।

আমাদের সম্মিলিত আত্ম-সংকল্পের অনুভূতি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি নতুন ধরনের প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমন এক বিকল্প প্ল্যাটফর্ম কল্পনা

করব যা ব্যক্তিগত অলিগার্কি বা জবাবদিহিহীন রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র নয় - কিন্তু বিগ টেকের শাসনের বাইরের একটি বিকল্প হতে হবে, সেই উত্তরই খুঁজে বার করা দরকার। জবাব অংশগ্রহণমূলক এবং বিকেন্দ্রীভূত শাসনের নতুন রূপের মধ্যে রয়েছে যা মানুষের স্বাধীনতাকে লাভের উপরে স্থান দেয়, ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্চিত করে।

টেকনোক্র্যাটিক অভিজাত গোষ্ঠী পোস্ট-ট্রুথ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে সামাজিক-প্রযুক্তিগত সিস্টেমের নকশা এবং নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বেশি উৎসাহী হবে। আমি এই ধারণাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-কেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র বলি - ডিজিটাল সম্পদের সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতির সংগঠন ও অবকাঠামো এবং ডিজিটাল সিস্টেমের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ যা আমাদের ডিজিটাল জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে। তাছাড়া বর্তমান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা এবং সংস্কারের প্রস্তাবও প্রকাশ করতে পারে। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা সমস্যাগুলির পদ্ধতিগত প্রকৃতি এবং কর্পোরেট ডিজিটাল অর্থনীতির এক্সট্রাক্টিভ মডেলের সাথে মৌলিকভাবে ভেঙে যাওয়া প্রকৃত বিকল্পর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তাভাবনাকে সহজ করে। শুধু ফেসবুক/মেটাকে পথে আনার উদ্যমের বাইরে, আমাদের উচিত আরও ভাল বিকল্প তৈরি করে এর পরিসর কীভাবে দখল নেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, প্ল্যাটফর্ম সমাজতন্ত্র প্রযুক্তির উপর পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পাল্টা-আধিপত্যবাদী প্রকল্প তৈরির কথাও বলবে। এই প্রস্তাবনা পুঁজির কেন্দ্রীভূত শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আমাদের জীবনের উপর এর নিয়ন্ত্রণ কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার উপরি-কাঠামো হতে পারে। এই আন্দোলন কিন্তু আদর্শ সমাজ তৈরির উদ্যম নয় বরং কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা এবং পণ্যায়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। প্রক্রিয়া হিসাবে, প্ল্যাটফর্ম সমাজতন্ত্র বিভিন্ন নীতির ক্ষেত্রের সংগ্রামগুলোকে জুড়বে এবং প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের স্তরে এগুলি নিয়ে আলাপ চালাবে। এটি আলোচনা এবং বিতর্ককে উৎসাহিত করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনের একটি নতুন স্থানাঙ্ক খুলে দেবে। একটি নির্দিষ্ট ব্লুপ্রিন্ট তৈরির পরিবর্তে, সংশোধন, সংযোজন এবং সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে।

আমাদের পরিকল্পনা অস্থায়ী, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আর আবিষ্কার-পরিমার্জনের চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হোক। ভবিষ্যৎ কর্পোরেট রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, সমাজ নির্ভর তন্ত্র কীভাবে কল্পনা করা যায় সে সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করার কাজটি আন্দোলনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আটকে আছে। যে বিষয়কে মার্ক্সের 'ইউটোপোফোবিয়া' [David Leopold, 'On Marxian Utopophobia', Journal of the History of Philosophy 54, no. 1 (2016), pp. 111–34] দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ রয়েছে। আমাদের বিকল্প অ-প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কল্পনা করতে বাধা তৈরি করছে এমন শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করা উচিত। আমাদের সমাজের সমস্যাজনক বৈশিষ্ট্যগুলির নেতিবাচক কথাবার্তা বলার পাশাপাশি, এই বিষয়ট কী কী ক্ষেত্র প্রতিস্থাপন করবে সে সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনা তৈরি করতে হবে। এই সময়ের প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদ আমাদের সুবিধের জন্য ভিন্ন উপায়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে কিভাবে তৈরি করা যেতে পারে তা কল্পনা করার তাগিদ বাড়িয়ে তুলেছে। বিগ টেকের বয়ানে কী ভুল আছে তার অনেকগুলি গবেষণা আছে, তবে এই ঝামেলাগুলো কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে তার জন্য কয়েকটা বিশদ প্রস্তাবনার প্রয়োজন। পুঁজিবাদী প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন নিয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান ছেড়ে বেরোতে হবে। প্রযুক্তিকে আমরা কোন ছাঁদে তৈরি এবং প্রয়োগ করব সে সম্পর্কে আমাদের নিজেদের তৈরি দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অনিবার্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার। মনে রাখা দরকার, যাকে আজ সম্ভাব্য

বলে মনে হচ্ছে, সেই সুযোগ নিজেই একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিসর। আমূল রূপান্তরের ভবিষ্যত চিত্র তৈরি করতে, সংস্কারের নতুন দাবি এবং ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা বর্তমান, আমাদেরকে নতুন বিশ্বকাঠামো কল্পনা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যাতে ভবিষ্যত কল্পনা করে আমরা এইসবকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে সক্রিয় অবদান পেশ করতে পারি। কীভাবে পুঁজিতন্ত্রের ইউটোপিয় চিন্তাভাবনা আমাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে এবং অসীম চাহিদা তৈরির দিকে আমাদের ঠেলে দেয়। চালু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্নির্মাণ করার একটি ত্রিফলা কৌশল নিতে হবে - প্রথমত, বিগ টেক কোম্পানিগুলির শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক আর বৃহত্তর গোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক ক্ষতির বিরুদ্ধে মাটির কাছাকাছি থাকা সংগ্রামে সামিক হতে হবে - দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের নিরাপত্তা বাড়াতে বর্তমান আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার কাজে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

সবশেষে, আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা এবং সহযোগিতামূলক উৎপাদনের প্রক্রিয়াগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে যা শেষ পর্যন্ত এই সংস্থাগুলিকে গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এই তিনটি কৌশল একে অপরের পরিপূরক। 'সংঘর্ষ-নির্মাণ'ই শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াবে এবং আরও শ্রমকর্মীকে ইউনিয়নে জোড়ার অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে। বিকল্প মডেলগুলির একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম আমরা কীভাবে ভবিষ্যতের কল্পনা করি সেটা প্রকাশ্যে বারবার জানান দিলে, তা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির নিয়ন্ত্রক বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শক্তিকে দুর্বল করবে। আমাদের বিগ টেকের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করতে হবে যা রাডিক্যাল দাবি রাখে এবং গণতন্ত্র, মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলিকে তাদের সংগঠনের কেন্দ্রে রাখে। আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে আমাদের সম্পর্ককে নতুন করে জুড়তে পারি।

এই প্রস্তাবনায় পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম, আমরা কীভাবে পণ্যচাহিদার মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের জন্য রিসেট বোতামটি টিপব এবং ডিজিটাল জীবনের জন্য মৌলিকভাবে নতুন নীতি তৈরি করব। কর্মী এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের বিগ টেকের বিরুদ্ধে লড়াইএর জন্য তৈরি হতে হবে। আমি আশাবাদী, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে সম্মিলিত শক্তির বিগ টেকের দুর্বলতার আন্দাজ আমাদের বৈপ্লবিক বিকল্পের দিকে যেতে উৎসাহ দেবে। স্থিতাবস্থার এই সময়ে আমরা এখন একটা বিশেষ চৌমাথায় আছি। আমরা ডিজিটাল-পুঁজির বিলিয়নেয়ারদের হাত থেকে আমাদের ডিজিটাল ভবিষ্যত পুনরুদ্ধার করতে পারি কিনা বা আমরা শোষণ ও আধিপত্যের পথ চালিয়ে যাব কিনা আগামী দশকে তা নিয়ে নির্ধারক প্রমাণিত হবে।

এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণকেরাই আমাদের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত ৩টে প্রকল্প সমীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোর সামাজিক গুরুত্ব এবং সমস্যা
নেতৃত্ব দেবব্রত দে
অন্তত ৮ মাস
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটে প্রকল্প ১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ২। কন্যাশ্রী ৩। সবুজসাথী নিয়ে রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা মধ্য বাংলা আর তরাই বাংলায় বিস্তৃত সমীক্ষা।
কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আশাকরি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে শুরু করতে পারব।

১০। গ্রন্থাগার প্রকল্প
৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

~~Kalaboti Mudra,~~
~~bank of india, J N Road Branch,~~
~~A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026~~